



তুহফাতুল হাদীস

মুফতী মনসূরুল হক



মাকতাবাতুল মানসূর
www.islamijindegi.com

প্রথম প্রকাশ : শাবান-১৪৩৫ হিজরী

তুহফাতুল হাদীস

মুফতী মনসুরুল হক

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়

মাকতাবাতুল মানসুর

০১৬৮১১৯৮৩৮১

সর্বস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থান

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার ঢাকা ০১৯১৪৭৩৫৬১৫ মাকতাবাতুল হেরা

৮২/১২এ, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

০১৯৬১৪৬৭১৮১

মূল্য : ১৩০ টাকা

ভূমিকা

ভারতবর্ষ মাযহাবপন্থী মুসলমানদের আবাসভূমি। এখানের মুসলমানরা মাযহাব মেনে ইসলাম পালনে অভ্যস্ত। বিশেষত এখানের অধিবাসীদের প্রায় ৯০ শতাংশই হানাফী মাযহাব মাননে-ওয়ালা। ১২৪৬ হিজরী পর্যন্ত চার মাযহাবের কোনো মাযহাব মানে না এমন মুসলমানের অস্তিত্ব এদেশে পাওয়া যায় না। ১২৪৬ হিজরীতে মৌলভী আব্দুল হক বেনারসী ইংরেজদের পরোক্ষ মদদে মুসলমানদের ঐক্যের মাঝে ভাঙ্গন সৃষ্টির জন্য আহলে হাদীস বা লা-মাযহাবী ফেরকার আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে হুসাইন আহমাদ বাটালবী এই ফেতনাকে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ মদদে আরো চাঙ্গা করেন।

বর্তমানে আমাদের দেশে লা-মাযহাবিয়াদের ফেতনা চরম আকার ধারণ করেছে। যুগে যুগে উলামায়ে কেরামই নব-উদ্ভাবিত সমস্ত ফেতনার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। একজন নায়েবে নবী হিসাবে চলমান এই ফেতনা সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানদেরকে সতর্ক করা আমি আমার দায়িত্ব জ্ঞান করি। আর সেই দায়িত্ব পালনের জন্য তারা যেসব মাসআলা নিয়ে ফেতনা করে থাকে, সেসব মাসআলা পরচা আকারে তৈরি করে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেছে। বক্ষ্যমান গ্রন্থটি সেই পরচাসমূহেরই সংকলন। গ্রন্থে প্রথমত হানাফী মাযহাবের দলীল উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বিতীয়ত লা-মাযহাবীদের দলীল উল্লেখ করা হয়েছে, তৃতীয়ত তাদের দলীল খণ্ডন করে তাদের ভ্রষ্টতা প্রমাণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, লা-মাযহাবীদের অনেক দলীল চার মাযহাবের কোনো কোনো মাযহাবে হুবাহু পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন হয়, তাহলে কি এসব মাযহাবের অনুসারীরাও ভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে? এর উত্তর হল: যারা কোনো মুজতাহিদের মাযহাব অনুযায়ী কুরআন-হাদীসের উপর আমল করবে তারা ভ্রষ্ট বিবেচিত হবে না। কারণ সাধারণদের দায়িত্ব হল মুজতাহিদের কাছে জিজ্ঞেস করে সে অনুযায়ী আমল করা (সূরা নাহল:১৬)। আর মুজতাহিদ ইজতিহাদ করতে গিয়ে কোনো ভুল করলে তার কোনো পাপ হয় না (আল ওরাকাত ফিল উসূল পৃ.৬৫)। বরং ভুল করলেও একটি সাওয়াব হয়, আর ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলে দুইটি সাওয়াব হয়। (বুখারী হা.২৩১) সুতরাং মাযহাবী মুসলমানরা মাযহাব মানতে গিয়ে ভ্রষ্টতার শিকার হবে না। আর লা-মাযহাবীরা যেহেতু কোনো মুজতাহিদকে মানে না, আর নিজেরাও তারা মুজতাহিদ নয়, তাই অনধিকার চর্চার অপরাধে তারা ভ্রষ্ট বিবেচিত হবে। তাদের উদাহরণ, হাতুড়ে চিকিৎসকের ন্যায়। যার ভুল চিকিৎসায় রোগী মারা গেলে এর দায়ভার তাকেই বহন করতে হয়।

যাই হোক কিতাব প্রকাশের এই শুভক্ষণে আমি আমার ঐসব শাগরিদদের বিশেষভাবে স্মরণ করছি যারা কিতাবের ‘মাওয়াদ’ সংগ্রহে আমাকে সহযোগীতা করেছে। আল্লাহ তাআলা উভয় জাহানে তাদেরকে কামিয়াব করুন।

মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই নির্ভুল করার চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। বিজ্ঞ কোনো পাঠক যদি কোনো ভুলের ব্যাপারে অবহিত করেন, তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করা হবে।

আল্লাহ তাআলা এই কিতাবের মাধ্যমে আম-খাস সবাইকে সমান উপকৃত করুন এবং এই মেহনতের উসীলায় লা-মাযহাবীদের ফেতনার দ্বার বন্ধ করে দিন। আমীন।

বিনীত

মুফতী মনসূরুল হক

১. নামাযে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কজি ধরা সুন্নাত	৫
২. নামাযে একাধিকবার রফয়ে ইয়াদাইন (হাত উঠানো) এর বিধান	১৬
৩. ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরা ফাতেহা পড়ার বিধান	২৯
৪. সূরা ফাতেহা শেষে আমীন আন্তে বলা সুন্নাত	৩৭
৫. রুকু থেকে সিজদায় যাওয়ার সুন্নাত	৪৭
৬. বিতির নামায এক সালামে তিন রাকাআত	৫৩
৭. শরয়ী প্রমাণপঞ্জির আলোকে তারাবীহের রাকাআত সংখ্যা	৬৩
৮. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ক্বাযা নামায পড়ার বিধান	৮৪
৯. ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের দলীল	৮৯
১০. জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ার বিধান	৯৬
১১. মহিলাদের নামায পুরুষদের নামায থেকে ভিন্ন	১০৫
১২. পুরুষদের জামাআতে মহিলাদের অংশগ্রহণ শরীয়ত কী বলে?	১১২
১৩. ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করার শরয়ী বিধান	১১৬
১৪. এক মজলিসে বা এক শব্দে তিন তালাকে শরয়ী বিধান	১২৭
১৫. আত্মার ব্যাধির চিকিৎসা ফরয	১৩৫

নামাযে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কজি ধরা সুন্নাত

নামাযে বাম কজির উপর ডান হাত রেখে দু'আঙ্গুল দ্বারা চেপে ধরা সুন্নাত। এ আমলটি একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, চার মাসহাবের ইমামগণই এই পদ্ধতিটিকে সুন্নাতরূপে গ্রহণ করেছেন।

নামাযে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কজি ধরা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ:

(১) হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. বলেন:

كان الناس يؤمرون: أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلوة .

অর্থ: লোকদেরকে এই আদেশ দেওয়া হত যে, তারা যেন নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখে। (বুখারী হা.৭৪০, মুসনাদে আহমাদ হা.২২৯১৫)

(২) হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলেন :

قلت لأنظرون إلى صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه، فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد .

অর্থ: আমি মনে মনে বললাম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ভাবে নামায পড়েন তা আমি লক্ষ্য করব। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন এবং উভয় হাত কান বরাবর উঠালেন। অতঃপর তার ডান হাত বাম হাতের কজি ও কজি-সংলগ্ন বাহুর উপর রাখলেন। (নাসাঈ:৮৮৯, আবু দাউদ: ৭২৬-৭২৭, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৩১৮, সহীহ ইবনে খুযাইমা:৪৮০,)

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল: উল্লেখিত হাদীসে ডান হাতের একটি অংশ অর্থাৎ হাতের তালু আর বাম হাতের তিনটি অংশের কথা বলা হয়েছে, অথচ হাতের তালু আর তালুর পিঠ, কজি এবং বাহু, এই তিনটি অংশের উপর একত্রে তখনই হবে, যখন কেউ ডান হাতের তালুকে বাম হাতের পিঠের উপর রেখে বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা কজি ধরে অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম হাতের কজি-সংলগ্ন (যেমন সামনে আসছে) বাহুর উপর সম্প্রসারিত করে দিবে।

এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ধরার সুন্নাত পদ্ধতিটি মনোযোগের সাথে খেয়াল করে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যায় সহীহ ইবনে খুযাইমায়। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে খুযাইমা রহ. [২২৩-৩১১হি.] যিনি সোনালি যুগের একজন মুহাদ্দিস তিনি তার গ্রন্থে উক্ত হাদীসের উপর শিরোনাম দিয়েছেন:

باب وضع بطن كف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا

অর্থাৎ: ডান হাত বাম হাতের তালুর পিঠ, কজি ও বাহুর উপর একই সাথে রাখবে। (আর এটা উপরে বর্ণিত পদ্ধতি ছাড়া সম্ভব নয়।)

অনুরূপ বর্ণনা সুনানে দারেমীতে সহীহ সনদে ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ اليمْنَى عَلَى الْيسْرَى قَرِيبًا مِنَ الرَّسْغِ.

অর্থ: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডান হাত বাম হাতের উপর কজির কাছে রাখতে দেখেছি। (সুনানে দারেমী:হা.১২৩৯)

(৩) হযরত হুলাব আত্ তাযী রা. বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُؤْمِنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমাম হতেন। তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাতকে চেপে ধরতেন। (তিরমিযী:হা.২৫২,ইবনে মাজা:৮০৯,ইবনে আবী শাইবা:৩৯৫৫) এখানে বাম হাতের কনুই ধরার কথা বলা হয়নি।

এ প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন:

حَدِيثُ حَلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: يَرُونَ أَنَّ يَضَعُ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ: أَنَّ يَضَعُهُمَا فَوْقَ السَّرَةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ: أَنَّ يَضَعُهُمَا تَحْتَ السَّرَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ.

হযরত হুলাব থেকে বর্ণিত হাদীসটি ‘হাসান’, এই হাদীসের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাবেঈন এবং পরবর্তী সকল আহলে ইলমের আমল। তারা নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতেন, কেউ নাভির উপর রাখা পছন্দ করতেন, আবার কেহ নাভির নিচে রাখা পছন্দ করতেন। তাঁদের নিকট উভয়টারই ব্যাপকতা ছিল।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল: পুরুষদের কেউ বুকের উপর হাত রেখেছেন, এমন কোনো প্রমাণ কারও থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না।

(৪) হযরত শাদ্দাদ ইবনে শুরাহবিল রা. বলেন:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يَدَهُ اليمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيسْرَى قَابِضًا عَلَيْهَا يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ. (مَجْمَعُ الزَّوَادِ: ২/২২৫)

অর্থ: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দণ্ডায়মান দেখলাম। তিনি নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাতটিকে চেপে ধরে আছেন। (এটি ‘মুসনাদে বায্যার’ ও ‘তাবারানী’ তেও রয়েছে, মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ:২/২২৫)

এখানেও ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে ধরার কথা বলা হয়েছে। এক হাতের বাহু আরেক হাতের বাহুর উপর রাখার কথা বলা হয়নি।

(৫) হযরত জারীর আদাবী বলেন: كان علي إذا قام في الصلوة، وضع يمينه على راسغه.

অর্থ: হযরত আলী রা. যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তার ডান হাত বাম হাতের কজির উপর রাখতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা:হা. ৩৯৬৯)

উল্লেখিত হাদীসগুলো থেকে যা বুঝা যায়, তা হলো:

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতেন।

২. ডান হাত দ্বারা বাম হাতকে চেপে ধরতেন।

৩. বাম হাতের কজি চেপে ধরতেন। যার ফলে হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ যেভাবে আমল করে থাকেন সেই পদ্ধতিকেই অধিকাংশ মাযহাবের আলেমগণ অবলম্বন করেছেন।

হালবী রহ. মুনইয়াতুল মুসল্লী এর শরাহ্ ‘গুনইয়াতুল মুতামল্লী’ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:-

السنة أن يجمع بين الوضع والقبض جمعاً بين ما ورد في الحديث المذكورة إذ في بعضها: ذكر الأخذ وفي بعضها: ذكر وضع اليد على اليد وفي البعض: ذكر وضع اليد على الذراع فكيفية الجمع أن يضع كف اليمين على كف اليسرى ويخلق الإبهام والخنصر على الرسغ ويسط الأصابع الثلاثة على الذراع فيصدق أنه وضع اليد على اليد وعلى الذراع وأنه أخذ شماله بيمينه .

অর্থ: “পূর্বোক্ত হাদীসগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনে সুন্নাত হলো: হাত বিছিয়ে রাখা ও বাঁধা” দু’টির উপরই একসঙ্গে আমল করা। কারণ, কিছু হাদীসে চেপে ধরার কথা এসেছে, আবার কিছু হাদীসে হাত হাতের উপর বিছিয়ে রাখার কথা এসেছে। আর কিছু হাদীসে বাহুর উপর হাত রাখার কথা এসেছে। এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি হলো: ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখবে, বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা গোল বৃত্তের ন্যায় বানিয়ে কজি ধরবে। অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম বাহুর উপর বিছিয়ে দিবে। তাহলে হাতের উপর হাত রাখা, বাহুর উপর হাত রাখা এবং ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরা সবগুলোই বাস্তবায়ন হবে। (গুনইয়াতুল মুতামল্লী: ৩০০)

লক্ষণীয় বিষয় হল: হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সবগুলো হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়, এটাই হল প্রকৃতপক্ষে হাদীসের অনুসরণ।

এক হাদীসকে গ্রহণ করে অন্য হাদীসকে অস্বীকার করা বা উপহাস করা এটা হাদীস মানা নয়। বরং হাদীস মানার নামে তামাশা করা ও হাদীস অস্বীকার করা। গাইরে

মুকাল্লিদ ভাইয়েরা বুখারী শরীফের যে হাদীসটিকে দলীলরূপে গ্রহণ করে বাম হাতের কনুই পর্যন্ত ডান হাতকে বিস্তৃত করে দেন, সেটাকে আমরা প্রথম দলীলরূপে গ্রহণ করেছি। এই হাদীসটি সম্পর্কে সহীহ বুখারীর বিখ্যাত ভাষ্যকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. স্বীয় গ্রন্থ ‘ফতহুল বারীতে’ বলেছেন:-

قوله (على ذراعه) أنهم موضعه من الذراع، وفي حديث وائل: عند أبي داود والنسائي ثم وضع يده اليمنى على ظهر كف يده اليسرى والرسغ والساعد. وصححه ابن خزيمة وغيره وسيأتي أثر علي رضي في أواخر الصلوة. (رقم: ৭৪০)

অর্থাৎ বাহুর কোন জায়গায় রাখতেন সেটা এই হাদীসে অস্পষ্ট, আবু দাউদ ও নাসাঈ শরীফে বর্ণিত ওয়াইল রা. এর হাদীসে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যা নিম্নরূপ:

অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠ, কজি ও বাহুর উপর রাখলেন। ইমাম ইবনে খুযাইমা রহ. ও অন্যান্যরা এটিকে সহীহ বলেছেন। বুখারী শরীফে সালাত অধ্যায়ের শেষদিকে হযরত আলী রা. থেকে অনুরূপ আসার উল্লেখ আসছে। (৭৪০ নং হাদীসের ব্যাখ্যায়)

হাত বেঁধে নাভির উপর রাখা

(১) হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলেন:

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله في الصلوة تحت السرة .

অর্থ: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নীচে রাখতে দেখেছি। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা:হা. ৩৯৫৯)

قال الشيخ عوامة في تحقيق هذا الحديث: وهذا إسناد صحيح، قال الإمام القاسم ابن قطلوبغا في كتابه التعريف والأخبار بتخريج أحاديث الإختيار بعد ما نقله سنداً ومتناً وهذا إسناد جيد وقال العلامة محمد عابد السندی في طوابع الأنوار على الدر المختار ‘ بعد تخريج هذا الحديث ورجاله كلهم ثقات وأثبت. (مصنف ابن أبي شيبة: ৩/৩২০)

অর্থ: শাইখ আওয়ামা দা. এই হাদীসের তাহকীকে বলেন: হাদীসটির সনদ সহীহ। ইমাম কাসেম ইবনে কুতলুবুগা রহ. স্বীয় গ্রন্থ ‘আত্ তা’রীফ ওয়ালা আখবার’ এ হাদীসটি সনদ ও মতনসহ উল্লেখ করে বলেন: সনদটি মজবুত ও শক্তিশালী এবং আল্লামা আবেদ সিন্ধী রহ. ‘তুওয়ালাউল আনওয়ার’ নামক গ্রন্থে এই হাদীসটি সনদ ও মতনসহ উল্লেখ করে বলেন ‘এই সনদের সবগুলো রাবী গ্রহণযোগ্য একজনও দুর্বল রাবী নেই’।

আল্লামা শাওকানী রহ. ‘নাইলুল আওতার’ গ্রন্থে প্রথমে হযরত ওয়াইল ইবনে হুজরের সংক্ষিপ্ত রেওয়ায়েত) وضع اليمنى على اليسرى ثم دان هات বাম হাতের উপর

রেখেছেন) উল্লেখ করার পর আহমাদ এবং আবু দাউদের তাফসীলী রেওয়ায়েত ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد (অতঃপর তিনি তার ডান হাত বাম হাতের তালুর পেট, কজি ও বাহুর উপর রাখলেন) উল্লেখ করার পর এর ব্যাখ্যায় বললেন:

والمراد: أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغهما وساعدهما. ولفظ الطبراني: وضع يده اليمنى على ظهره اليسرى في الصلوة قريباً من الرسغ.

অর্থাৎ এর মর্ম হলো: তিনি তার ডান হাত বাম হাতের তালুর পিঠে, কজি ও বাহুর উপর রেখেছেন। তাবারানীর বর্ণনায় শব্দ এরূপ: তিনি নামাযে তার ডান হাত বাম হাতের পিঠের উপর কজির কাছে রেখেছেন। (নাইলুল আওতার:২/১৮৮)

(২) হযরত আলী রা. বলেন:

إن من السنة في الصلوة: وضع الألف على الألف في الصلوة تحت السرة (أحمد ১/১১০:أبو داود: في رواية ابن الأعرابي وابن داسة ৭৫৬: ذكره الشيخ عوامة في نسخته المحقق لأبي داود، والدارقطني ১/২৮৫: ابن أبي شيبة ৩৯৬: وفيه عبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطي ضعيف، لكن يشهد له الحديث السابق)

অর্থ: নামাযে সুনাত হলো: তালু তালুর উপর রেখে নাভির নীচে রাখা। (মুসনাদে আহমাদ: ১১০, আবু দাউদ: হা. ৭৫৬, দারাকুতনী: ১/২৮৫, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: হা. ৩৯৬ এই সনদে আবু শাইবা আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আল ওয়াসেতী রয়েছে যদিও তিনি দুর্বল, কিন্তু প্রথম হাদীসটি এর সমর্থন করছে, কাজেই ঐ দুর্বলতা দূর হয়ে গিয়েছে।)

(৩) হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন:-

أخذ الألف على الألف في الصلوة تحت السرة. (أبو داود ৭৫৮: وفيه أيضاً عبد الرحمن المذكور) অর্থ: নামাযে হাতের তালু দিয়ে অপর তালু ধরে নাভির নীচে রাখবে। (আবু দাউদ: হা. ৭৫৮ এতেও পূর্বোক্ত আব্দুর রহমান রয়েছে যার দুর্বলতা দূর হয়ে গেছে।)

(৪) হযরত হাজ্জাজ ইবনে হাঙ্গান রহ. বলেন:-

سمعت أبا مجلز وسألته: قال قلت كيف أضع؟ قال: يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلها أسفل من السرة. (مصنف ابن أبي شيبة ৩৯৬: وقال المارديني في الجوهر النقي ২/৩১: سنده جيد)

অর্থ: আমি আবু মিজলায রহ.কে বলতে শুনেছি, অথবা হাজ্জাজ বলেন: আমি আবু মিজলাযকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নামাযে কীভাবে হাত বাঁধবে? তিনি প্রত্যুত্তরে

বললেন: ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রেখে নাভির নীচে রাখবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: হা. ৩৯৬৩, ইমাম মারদীনী রহ. স্বীয় কিতাব ‘জাওহাররুন্ নাকী’তে এই আসার সম্পর্কে বলেন: এর সনদ জায়্যিদ-২/৩১)

(৫) ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বলেন:-

يضع يمينه على شماله في الصلوة تحت السرة (مصنف ابن أبي شيبة: ৩৯৬০)

অর্থ: নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নীচে বাঁধবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ৩৯৬৯, এর সনদটি হাসান)

(৬) আল্লামা ইবনুল মুনযির রহ. তার ‘আল-আওসাত’ গ্রন্থে লিখেছেন:

وقال إسحاق: تحت السرة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع (الأوسط: ৩/২৪৩)

অর্থ: হযরত ইসহাক রহ. (যিনি ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাদ) তিনি বলেছেন: নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীস অধিক শক্তিশালী এবং বিনয়ের নিকটতর। (আল-আওসাত: ৩/২৪৩)

বুকের উপর হাত বাঁধা সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদীস নেই

বুকের উপর হাত বাঁধা সম্পর্কে যে দলীলসমূহের আশ্রয় নেওয়া হয়, সেগুলোর অবস্থা নিম্নরূপ:-

১. হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. এর হাদীস (সহীহ ইবনে খুযাইমা: ১/২৭৩) এটি সহীহ হাদীস নয়। এর সনদে মুয়াত্তাল ইবনে ইসমাঈল আছেন, তিনি সুফিয়ান ছাওরী থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, মুয়াত্তালকে ইমাম বুখারী ‘মুনকারুল হাদীস’ বলেছেন এবং তিনি এ কথাও বলেছেন: আমি যাকে ‘মুনকারুল হাদীস’ বলবো, তার সূত্রে বর্ণনা করা বৈধ হবে না।

ইবনে সা’দ, আবু যুরআ’ রাযী, আবু হাতেম রাযী ও দারাকুতনী প্রমুখ তাকে ‘অত্যধিক ভুলের শিকার’ আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থে বলেছেন: (مؤمل بن إسماعيل في) (حديثه عن الثوري ضعيف) সুফিয়ান হতে মুয়াত্তালের বর্ণনায় দুর্বলতা আছে। (৫১৭২ নং হাদীসের অধীনে) এবং সুফিয়ান ছাওরীর অন্য বর্ণনার বিপরীত। আর এই হাদীসে মুয়াত্তাল ইবনে ইসমাঈলেরই যে ভুল হয়েছে তা প্রমাণিত হয় ওয়ায়েল ইবনে হুজর হতে বর্ণিত রেওয়ায়েতগুলোর সনদে নজর বুলালে- ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. থেকে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছে তার ছাত্র কুলাইব, তার থেকে আসেম, আর আসেম থেকে রেওয়ায়েত করেছে তার নয়জন ছাত্র, যথা:

১. বিশর ইবনে মুফাজ্জাল

২. য়ায়েদা

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে ইদরীস

৪. আব্দুল ওয়াহেদ

৫. শু'বা

৬. যুহাইর ইবনে মুআবিয়া

৭. সালাম ইবনে সুলাইম

৮. খালেদ ইবনে আব্দুল্লাহ

৯. সুফিয়ান সাওরী

আসেমের এই নয়জন ছাত্রের আটজনই (على الصدر) 'বুকের উপর' উল্লেখ করেননি। শুধু সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে এই শব্দটি পাওয়া যায়। আর সুফিয়ান সাওরীর দুইজন ছাত্র এই হাদীসটি তার থেকে রেওয়ায়েত করেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়ালীদ এবং মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈল। এই দুইজনের মধ্য থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়ালীদও 'বুকের উপর' শব্দটি উল্লেখ করেননি, শুধু মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈলই 'বুকের উপর' শব্দ উল্লেখ করেছেন। আর খোদ ইমাম সুফিয়ান সাওরীর আমলও এই হাদীস অনুযায়ী ছিল না। ইমাম নববী লিখেন, 'ইমাম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ইবনে রাহুয়া ও আমাদের শাফেয়ীদের মধ্যে আবু ইসহাক মারওয়াযী বলেন, উভয় হাত নাভির নিচে বাধবো।'

এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, 'বুকের উপর' শব্দটি মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈল ভুলবশত বৃদ্ধি করেছেন। তাই এই হাদীস দ্বারা দলীল দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। (শরহে মুসলিম:১/৭৩, আবু দাউদ:১/১১২, মুসনাদে আহমাদ:৪/৩১৮, বাইহাকী:২/১৩১)

عن طائوس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلوة. (أبو دود(٩٥٩) -وعزاه المزني (٢٩ ١٨٦-) إلى أبي دود في المراسيل) -

২. তাউসের বর্ণনাটি আবু দাউদ শরীফের ৭৫৯ হাদীস। এটি 'মুরসাল' তথা সূত্র বিচ্ছিন্ন, আর মুরসালকে তারা প্রামাণ্য মনে করে না। তদুপরি এতে 'সুলাইমান ইবনে মুসা' নামের একজন রাবী আছেন। তার সম্পর্কে বুখারী রহ. বলেছেন: (عنده) তার কাছে অনেক মুনকার বিষয় আছে।

ইমাম নাসাঈ রহ. বলেছেন: (ليس بالقوي) তিনি মজবুত রাবী নন। (দ্রঃ আল-কাশিফ)

৩. বুকের উপর হাত বাঁধা সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে একটি হাদীস বাইহাকীতে আছে (বাইহাকী হা.নং২১৩৩) এটির সনদে রওহ ইবনুল মুসায্যাব

আছে, তিনি চরম দুর্বল রাবী। ইবনে হিব্বান তার সম্পর্কে বলেছেন: তিনি বিশ্বস্ত লোকদের সূত্রে জাল হাদীস বর্ণনা করতেন, তার থেকে হাদীস নেওয়া জায়েয নেই। ইবনে আদী বলেছেন: أحاديثه غير محفوظة তার হাদীস সঠিক নয়। (তাহীরুত তাহীব:৪/২৩১)

৪. হযরত আলী রা. এর হাদীসটি বুখারীর ‘তারীখে কাবীরে’ আছে। কিন্তু এই হাদীসটি একই সনদে ইবনে আবী হাতেম ‘আল জারছ ওয়াত তা’দীল’ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেখানে নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখার কথা আছে ‘বুকের উপর’ (على الصدر) কথাটি নেই। তেমনিভাবে মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবায় এটি উল্লেখ আছে, সেখানেও বুকের উপর কথাটি নেই। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা:হাঃ৩৯৬২)

উপরন্তু, ইমাম বুখারী ‘আত তারীখুল কাবীর’ গ্রন্থে উক্ত হাদীসটিকে সমর্থন করেননি। বরং সেটি উল্লেখ করার পর বলেছেন।

وقال قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن عن يزيد ابن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عقبة من أصحاب علي عن علي رض: وضعهما على الرسغ .

অর্থ: কুতায়বা রহ. হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমানের সূত্রে ইয়াযীদ ইবনে আবুল জা’দ থেকে, তিনি আসিম জাহদারীর সূত্রে হযরত আলী রা. এর ছাত্র উকবা থেকে, তিনি হযরত আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন: তিনি তার হাত কজির উপর রাখলেন। (আত তারীখুল কাবীর: ৬৪৩৭)

এ কারণেই আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে সূরা কাউছার এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: (يروى هذا عن علي ولا يصح) এ হাদীসটি সহীহ নয়।

(৫) হযরত হুলাব রা. এর হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে ৫/২২৬) আছে, সুফিয়ান থেকে শুধু ইয়াহইয়াই বুকের উপর হাত বাঁধার কথাটি উল্লেখ করেছেন। মুসনাদে আহমাদে ও দারাকুতনীতে ওয়াকী ও আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. দু’জন সুফইয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তার বর্ণনায় বুকের উপর হাত বাঁধার কথা নেই। তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদে সুফইয়ানের সঙ্গী আবুল আহওয়াস একই উস্তাদ সিমাক থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। তাদের কারও বর্ণনাতেই বুকের উপর হাত বাঁধার কথা নেই। সুতরাং এটি ‘শায’ (দুস্প্রাপ্য) হাদীস যা গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লামা নিমাবী রহ. ‘আছারুস্ সুনান’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন:

ويقع في قلبي: أن هذا تصحيف من الكاتب، والصحيح: يضع هذه على هذه، فيناسبه قوله: وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل ويوافقه سائر الروايات .

অর্থ: আমার মনে হয়, **على صدره** (বুকের উপর) এটি অনুলেখকের ভুলের কারণে এমনটি হয়েছে, সঠিক হল: এই হাতটি এই হাতের উপর রেখেছেন, এতে করে এটি পরের কথার সঙ্গেও মিল হয়, কারণ, পরে বলা হয়েছে: ইয়াইয়া ডান হাত বাম হাতের কজির উপর রেখে দেখিয়েছেন, আর এটি তখন অন্যান্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সাথেও সঙ্গতি পূর্ণ হয়। (আছাররুস সুনান: ১০৮)

এ হিসেবে এই হাদীসটি হানাফীদের দলীল হয়ে যায়। লক্ষণীয় বিষয় হল, তাদের একটি দলীলও সহীহ নয়। আব্বাহ তাআলা যেন আমাদেরকে দীনের সঠিক বুঝ দান করেন এবং তদনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করেন। আমীন।

নামাযে একাধিকবার রফয়ে ইয়াদাইন (হাত উঠানো) এর বিধান

একাধিক সহীহ হাদীস এবং অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালিহীনের অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা এ কথা প্রমাণ করে যে, নামাযে শুধু প্রথম তাকবীরের সময় কান পর্যন্ত হাত তোলা সুন্নাত। এছাড়া রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে উঠার সময় এবং তৃতীয় রাকাআতে উঠার সময় হাত তোলা সুন্নাত নয়। যেমন, সেজদায়ে সাহুর সময়, দুই সেজদার মাঝে এবং প্রত্যেক উঠা- নামার সময় হাত তোলা সুন্নাত নয়। নিম্নে এই মাসআলার স্বপক্ষে সহীহ হাদীস ও আছার উল্লেখ করা হলো:

১ম দলীল: আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سورة: المؤمنون ٢-٥:

ইবনে আব্বাস রা. এ আয়াতের তাফসীরে বলেন:

مُخْبِتُونَ مُتَوَاضِعُونَ لَا يَلْتَفِتُونَ يَمِينًا وَلَا يَرْفَعُ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ.

এখানে خائسون দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: অত্যন্ত একাগ্রতা ও বিনম্রভাবে দাঁড়ানো ডানে বামে না দেখা এবং রফয়ে ইয়াদাইন না করা, অর্থাৎ-বারবার হাত না তোলা। (তাফসীরে ইবনে আব্বাস ২১২)

হযরত হাসান বসরী রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন:

خاشعون الذين لا يرفعون أيديهم في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى

এই আয়াতে **خاشعون** দ্বারা উদ্দেশ্য হল, প্রথম তাকবীর ব্যতীত নামাযে আর হাত না উঠানো।

২য় দলীল: (তাফসীরে সমরকন্দী-২/৪০৮)

عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا افتتح الصلوة، رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لايعود. (أخرجه أبو داود ٩٤٢-وابن أبي شيبة٢٨٤٤-والطحاوى،عبدالرزاق في المصنف:٢٤٥٥)

অর্থ: হযরত বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করার সময় কানের কাছাকাছি হাত তুলতেন, এরপর আর কোথাও হাত তুলতেন না। (আবুদাউদঃ হাদীস নং-৭৫২, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-হাদীস নং-২২, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকঃ হাদীস নং-২৫৩০, দারাকুতনী-হাদীস নং-২২)

মুহাদ্দিস যফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন: হাদীসটি হাসান এবং এর দ্বারা দলীল দেওয়া যায়। (ই-লাউস্পুনান ৩/৮৬)

৩য় দলীল

عن علقمة قال: قال عبدالله بن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. (أخرجه أبو داود - ٩٨٧- الترمذى ٢٥٩-، وقال الترمذى: حديث حسن و به يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعيناه ورجاله رجال مسلم، كذا في الجوهر النقي ١/٥٩- وصححه ابن حزم في المحلى: ٣/٦٦)

৪র্থ দলীল:

عن ابن مسعود: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم و أبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلوة. (أخرجه البيهقي وإسناده جيد. كذا في الجوهر النقي. إعلاء السنن- ٣/٦٦- ٢١١:

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রা. এর পিছনে নামায আদায় করেছি, তাদের কেউ তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত হাত উঠাতেন না। (বাইহাকী হা.নং ৮২১, ইলাউস্পুনান-৩/৬৮)

وقال أحمد شاکر في تعليقه: هذا الحديث صححه ابن حزم وغيره من الحفاظ وهو حديث صحيح، وما قالوا في تعليقه ليس بعله.

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন: আমি কি তোমাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের মত নামায পড়ব না? একথা বলে তিনি নামায পড়লেন এবং তাতে শুধু প্রথমবারই হাত তুলেছিলেন।

(আবু দাউদ হাদীস নং-৭৪৮, তিরমিযী হাদীস নং-২৫৭, নাসাঈ হাদীস নং- ১০৫৮, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হাদীস নং- ২৪৫৬, মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং- ১/৩৮৮)

মুহাদ্দিস আশ্বাদ শাকির এ হাদীস সম্পর্কে বলেন: ইবনে হাযম এবং অন্যান্য হাফিযুল হাদীস এই হাদীসটিকে ‘সহীহ’ বলেছেন। কেউ কেউ এর বর্ণনাগত ত্রুটি’র কথা উল্লেখ করে বলেছেন: বস্তুত সেগুলো ত্রুটি হিসেবে পরিগণিত নয়।

আল্লামা আলাউদ্দীন আততুরকুমানী রহ. বলেন: এই হাদীসের সকল রাবী সহীহ মুসলিমের রাবী। (আল জাওহারুন নাকী-২/৭৮)

উল্লেখ্য যে, ইমাম তিরমিযী রহ. সুনান গ্রন্থে ইবনুল মুবারকের যে মন্তব্য উল্লেখ করেছেন তা উপরোক্ত বর্ণনা সম্পর্কে নয়, বরং তা অন্য একটি হাদীস সম্পর্কে যা নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে: أنه عليه السلام لم يرفع يديه إلا في أول مرة.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু প্রথমবার হাত উঠিয়েছেন। এ হাদীসটির ব্যাপারে ইবনে মুবারক রহ. আপত্তি করেছেন, পূর্বেরটি নয়। এই দুই বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য না জানা থাকার কারণে অনেক আলেম বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন কিংবা অন্যকে বিভ্রান্ত করেছেন। (দেখুন: নসবুর রায়হ: ১/৩৪২)

এজন্য সুনানে তিরমিযীর বিভিন্ন নুসখায় দ্বিতীয় বর্ণনাটি ভিন্ন শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেখানে ইবনুল মুবারকের মন্তব্যও রয়েছে। অতএব তাঁর এই মন্তব্য আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে নয়। (দেখুন: জামে তিরমিযী: ২/৪২, তাহকীক আহমাদ শাকের)

এখানে মুহাদ্দিস আহমাদ শাকিরের পর্যালোচনা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেন, ‘রফয়ে ইয়াদাইন বিষয়ে এক শ্রেণীর মানুষ যঈফ হাদীসকে সহীহ আর সহীহ হাদীসকে যঈফ সাব্যস্ত করার প্রয়াস পেয়ে থাকে। তাদের অধিকাংশই নীতি ও ইনসাফ বিসর্জন দিয়ে থাকে।’ (জামে তিরমিযী মুহাক্কাক-২/৪২)

বর্তমান সময়ে আহলে হাদীস বন্ধুগণও তাদের সমশ্রেণীর পূর্বের লোকদের মত সহজ সরল জনগণকে একথা বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, ‘রাফয়ে ইয়াদাইন’ না করার বিষয়ে যে হাদীস এসেছে, সেগুলো যঈফ। তাদের এ কথায় যাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত না হয়, এ জন্য আমরা এ বিষয়ের হাদীসগুলোর সঙ্গে বড় বড় মুহাদ্দিসের স্বীকৃতিও উল্লেখ করেছি।

৫ম দলীল:

عن جابر ابن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلوة، (رواه مسلم: ৪৩০)

অর্থ: হযরত জাবির ইবনে সামুরা রা. বলেন: [একদিন] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে (নামায়ে ‘রাফয়ে ইয়াদাইন’ করতে দেখে) বললেন: ব্যাপার কি? তোমাদের দেখছি অব্যাহা ঘোড়ার লেজের মতো করে হাত উঠাচ্ছে। নামায়ে স্থির থাকো! (সহীহ মুসলিম-হাদীস নং- ৪৩০)

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থিরতার সঙ্গে নামায পড়ার আদেশ দিয়েছেন। আর হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী যেহেতু রফয়ে ইয়াদাইন স্থিরতা

পরিপন্থী, তাই আমাদের কর্তব্য হলো: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশমতো স্থিরতার সঙ্গে নামায পড়া।

উল্লেখ্য যে, হযরত জাবের রা. থেকেই সহীহ মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় সালামের সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করতে বা হাত তুলতে নিষেধ করেছেন। সেই হাদীসে **أَذْنَابُ خَيْلِ شَمْسٍ كَأَنَّهُا** অর্থাৎ ‘অবাধ্য ঘোড়ার লেজের ন্যায়’ শব্দটি এসেছে। এখান থেকে কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে, উভয় বর্ণনার বিষয়বস্তু এক, কাজেই সালামে হাতের ইশারা নিষেধ হলেও বস্তুত অন্য সময়ের রফয়ে ইয়াদাইন নিষেধ হয়নি।

তাদের এ ধারণা ঠিক নয়, দু’টো সম্পূর্ণ ভিন্ন হাদীস এবং দুই হাদীসে ভিন্ন ভিন্ন বিধান দেওয়া হয়েছে।

বর্ণনা দু’টির ৪টি পার্থক্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(ক) এ হাদীস থেকে বুঝা যায়: সাহাবীগণ একা একা নামায পড়ছিলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে তাদেরকে বারবার হাত তুলতে দেখে ঐ কথা বলেছিলেন। পক্ষান্তরে অপর হাদীসটিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে জামাআতে নামায পড়েছিলেন এবং সালাম ফিরানোর সময় হাত দিয়ে ইশারা করেছিলেন।

(খ) এ হাদীস থেকে বুঝা যায়: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন নামাযের মধ্যে হাত তোলার কারণে। পক্ষান্তরে অপর হাদীসটিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন হাত তোলার কারণে নয়, বরং সালামের সময় ডানে-বামে হাত দিয়ে ইশারা করার কারণে।

(গ) এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার হাত না তুলে শান্ত ও স্থির থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ অপর হাদীসটিতে সালাম ফিরানোর পদ্ধতি শিখিয়েছেন। (দ্র.নাসবুর রায়াহ)

(ঘ) সালামের সময় হাত উঠানে-ওয়ালাকে এ কথা বলা যায় না যে, ‘তুমি নামাযে স্থির থাকো’। কেননা সালামের দ্বারা তো নামায থেকে বের হয়ে যায়। তাই দ্বিতীয় বর্ণনায় যেখানে সালামের সময় হাত উঠানোর কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, তাতে এই বাক্যটি: **اسكنوا في الصلاة** নেই।

দুই বর্ণনার মধ্যে এতগুলো পার্থক্য থাকা অবস্থায় কীভাবে বলা যায় যে, দুই হাদীসের বিষয়বস্তু এক? এটা কীভাবে সম্ভব যে, হযরত জাবির রা. এর মতো বিজ্ঞ সাহাবী একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে, ভিন্ন মাসে ও ভিন্ন প্রেক্ষাপটসহ বর্ণনা করবেন?

সাহাবায়ে কেলাম রা. হাদীস বর্ণনার বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী বর্ণনা করতেন কোনো ধরনের সংযোজন বিয়োজন ছাড়া। তাই এটা পরিষ্কার যে, এ দুইটি হাদীস সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং উভয় হাদীসের বিষয়বস্তুও ভিন্ন। সুতরাং সালামে যেমন হাতের ইশারা নিষেধ, তেমনিভাবে রুকু সময়ও হাত তোলা অন্যান্য হাদীস দ্বারা নিষেধ। উভয় হাদীসকে সালামের সময় হাত তোলা নিষেধ এমর্মে পেশ করা যাবে না, যা আহলে হাদীস বন্ধুগণ করে থাকেন।

৬ষ্ঠ দলীল:

عن ابن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع فلا يرفع ولا بين السجدة تين. (أخرجه الحميدى فى مسنده من طريق سفيان قال ثنا الزهرى قال أخبرنى سالم بن عبد الله عن أبيه، وسنده صحيح ٢/٢٩٩ برقم: ٦١٨)

অর্থ: হযরত ইবনে উমর রা. বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি: তিনি যখন নামায শুরু করতেন, তখন কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন। আর যখন রুকু করতে চাইতেন এবং রুকু থেকে উঠতেন, তখন হাত উঠাতেন না, দুই সেজদার মাঝেও না।

ইমাম বুখারীর উস্তাদ হুমাইদী রাহ. তাঁর মুসনাদে এই হাদীস এনেছেন এবং এর সনদ সহীহ। (মুসনাদে হুমাইদী হাদীস নং-নং ৬১৪)

৭ম দলীল:

عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. رواه البيهقى فى الخلافيات، قال الحافظ مغلطائى: لأبأس بسنده وقال الشيخ عابد السندى: هذا الحديث عندى صحيح لا محالة رجاله رجال الصحيح، راجع (الإمام ابن ماجة وكتابه السنن ص ٢٤٢ قلت: ويؤيده أيضاً عمل ابن عمر على وفقه كما عند الطحاوى ١/١١٥ وابن أبى شيبه ٢/٢٨٦-)، والبيهقى فى المعرفة.....

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন, তখন একবার ‘রফয়ে ইয়াদাইন’ করতেন, এরপর আর করতেন না। (বাইহাকী, আল খিলাফিয়াত)

হাফিয মুগলতাসী রহ. বলেছেন: এর সনদে কোনো সমস্যা নেই। শাইখ আবিদ সিন্দী রহ. বলেছেন: আমাদের দৃষ্টিতে এটি অবশ্যই সহীহ।

৮ম দলীল:

عن عباد ابن الزبير قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة، رفع يديه في أول الصلاة ثم لم يرفعهما في شيء حتى يفرغ. (أخرجه البيهقي في الخلافيات كما في نصب الراية (808/5))

অর্থ: আব্বাদ ইবনে যুবাইর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন, তখন শুধু নামাযের শুরুতেই উভয় হাত তুলতেন, এরপর নামায শেষ করা পর্যন্ত আর কোথাও হাত তুলতেন না। (নাসবুর রায়াহ-১/৪০৪)

এই হাদীসটির সনদ সম্পর্কে যুগ-শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন: এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত।

৯ম দলীল: খুলাফায়ে রাশেদীনও রফয়ে ইয়াদাইন করেননি

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা নিমাতী রহ. খুলাফায়ে রাশেদীন এর কর্মধারা বিষয়ক বর্ণনাগুলোর পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে,

وأما الخلفاء الأربعة فلم يثبت عنهم رفع الأيدي في غير تكبيرة الإحرام. (أثار السنن ص—(580))

খুলাফায়ে রাশেদীন শুধু প্রথম তাকবীরের সময় ‘রফয়ে ইয়াদাইন’ করতেন, অন্য সময়ে ‘রফয়ে ইয়াদাইন’ করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এর বিরুদ্ধে তাদের থেকে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার কোনোটিই ঐটি মুক্ত নয়, সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য নয়।

খুলাফায়ে রাশেদীন আশ্বিয়ায়ে কেরাম রা. এরপর মানবজাতির মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সত্যিকারের অনুসারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সুন্নাহকেও নিজের সুন্নাহর মতো অনুসরণীয় ঘোষণা করেছেন। কেননা তাদের সুন্নাহ ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ থেকেই গৃহীত তাই তাঁরা যখন নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য কোনো স্থানে হাত উঠাতেন না, তখন এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁদের কাছেও নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য কোনো স্থানে ‘রফয়ে ইয়াদাইন’ না করা চাই। আর এটিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ।

আহলুল হাদীস ভাইদের দলীল ও তার পর্যালোচনা

আহলুল হাদীস বন্ধুগণ যেসব হাদীস পেশ করেন, তা দু’ ধরনের, কিছু আছে প্রবীণ সাহাবায়ে কেরাম থেকে এবং কিছু আছে নওমুসলিম সাহাবা থেকে। সুতরাং দু’ প্রকার হাদীসের দু’ ধরনের জওয়াব।

(ক) প্রবীণ সাহাবীদের রেওয়ায়াত: যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর হাদীস:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا
كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. (متفق عليه)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে
যাওয়ার সময় এবং উঠার সময় হাত তুলতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর মৌখিক এবং আমলী রেওয়য়াত দেখুন,
তাহলে এ হাদীসের জওয়াব সহজেই বুঝে আসবে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর
বিশিষ্ট তিনজন শাগরিদ হযরত মুজাহিদ, আব্দুল আজিজ ও আবুল আলিয়া রহ.
সকলেই তার আমল শুধুমাত্র নামাযের শুরুতে হাত উঠানোর কথা বর্ণনা করেছেন।
ইবনে উমর রা. এর বিশিষ্ট শাগরেদ মুজাহিদ রহ. বলেন:

ما رأيت ابن عمر رضي — يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح. (مصنف ابن أبي شيبة(١/٢٣٩)

অর্থ: আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.কে শুধুমাত্র নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য কোনো
সময় হাত তুলতে দেখিনি। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-১/২৩৭, জাওহারুন নাকী কিতাবে এ
সনদটিকে সহীহ বলা হয়েছে-৩/৭৩, আব্দুল আজিজ এর বর্ণনার জন্য দেখুন: মুআত্তা হা.১০৮)

قال ابن عمر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرفع أيدينا في بدء الصلاة وفي داخل
الصلاة عند الركوع، فلما ها جر النبي صلى الله عليه وسلم ترك رفع اليدين في داخل الصلاة

عند الركوع و ثبت على رفع اليدين في بدء الصلاة. (أخبار الفقهاء والمحدثين(٣٩٧-)

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন: আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামের সাথে মক্কায় থাকাকালীন নামাযের শুরুতে এবং নামাযের ভিতরে রুকুর
সময় হাত উঠাতাম, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত
করে মদীনা চলে আসলেন, তখন নামাযের মধ্যে রুকুর সময় হাত উঠানো বন্ধ করে
দিলেন, শুধুমাত্র নামাযের শুরুতে হাত উঠানো অব্যাহত রাখলেন। (আখবারুল ফুকাহা
ওয়াল মুহাদ্দিসীন লিল কাইরুনী-পৃ.২১৪, হাদীস নং-৩৭৮)

যে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর হাদীস দ্বারা ‘আহলে হাদীস’ বন্ধুগণ দলীল দিচ্ছেন,
তাঁর শাগরিদগণ তাঁর বছরের পর বছরের আমল বর্ণনা করছেন যে, তিনি নামাযের
শুরুতে ছাড়া নামাযের মধ্যে কোথাও হাত তুলতেন না, কোনো সাহাবী নিজে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস বর্ণনা করার পর কি নিজেই
তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন? কখনোই না। সুতরাং বুঝতে হবে যে, নামাযের
ভিতরে হাত তোলার বিধানটি মূলত মদীনা আসার পর রহিত হয়ে গিয়েছিল, যেমনটি
তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর মৌখিক হাদীসে বর্ণনা করে দিয়েছেন, কাজেই
আহলে হাদীস বন্ধুগণ যে হাদীসটি পেশ করে থাকেন, যদিও তার সনদ বুখারী ও
মুসলিমের, কিন্তু ওটা মূলত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর মক্কী যমানার হাদীস যা
মদীনায় হিজরতের পর রহিত হয়ে গিয়েছে, যে কারণে তিনি একবার মাত্র হাত

তুলতেন। কোনো হাদীসের সনদ সহীহ হলেই সেটা আমলযোগ্য প্রমাণিত হয় না। হ্যাঁ যদি তার হুকুম রহিত না হয়ে থাকে তাহলে আমলযোগ্য হয়।

তাছাড়া আহলে হাদীস বন্ধুরা যেভাবে রফয়ে ইয়াদাইন করে থাকেন তথা রুকুতে যাওয়া, রুকু থেকে ওঠা ও সিজদা থেকে উঠে, এই রফয়ে ইয়াদাইন ইবনে উমর রা. এর এই হাদীস থেকে সাবেত হয় না। কেননা হযর ইবনে উমর রা. এর হাদীসে শুধু রুকুতে যাওয়া ও রুকু থেকে উঠার সময় রফয়ে ইয়াদাইনের কথা উল্লেখ আছে। সিজদা থেকে উঠে রফয়ে ইয়াদাইন করার কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং এ হাদীস তাদের আমলের পক্ষে দলীল হয় না।

এ সহজ সরল কথাটি না বুঝতে পারায় ‘আহলে হাদীস’ বন্ধুগণ ধোঁকায় পড়েছেন।

(খ) আহলে হাদীস বন্ধুদের দ্বিতীয় দলীল কতিপয় নওমুসলিম সাহাবীদের রেওয়ায়েত:

যথা-১. মালিক ইবনে হুয়াইরিস রা. থেকে বর্ণিত

رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سَجُودِهِ. (المحلى)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকুথেকে উঠার সময়, সিজদায় যাওয়ার সময় এবং সিজদা থেকে উঠার সময় হাত তুলতেন। (মুহাল্লা)

২. ওয়াইল ইবনে হুজরের রেওয়ায়েত:

عن وائل بن حجر قال: " صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان إذا كبر رفع يديه، ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه، فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم سجد، ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه، حتى فرغ من صلاته .

এ হাদীসেও দেখা যাচ্ছে যে, নামাযের ভিতরে রুকুতে যাওয়া, রুকু থেকে ওঠা ও সিজদায় যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত তুলতেন। (মুহাল্লা:২/৫৮৪)

এখানে চিন্তা করার বিষয় হল যে, শুধু নও মুসলিম সাহাবীগণ হাত তোলার হাদীস বর্ণনা করেছেন, অপর দিকে প্রবীণ সাহাবীগণ যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাজ-কর্ম অনুসরণ করার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, বিশেষ করে চার খলীফা রা. তারা কেউ নামাযের ভিতরে হাত উঠানোর হাদীস বর্ণনা করেননি বা নিজেরা আমলও করেননি। যেমন চার খলীফার আমল দেখুন:

وأما الخلفاء الأربعة، فلم يثبت عنهم رفع الأيدي في غير تكبيرة الإحرام.

এখানে স্পষ্ট হলো যে, চার খলীফার কেউ নামাযের ভিতরে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত হাত তুলতেন না। (আসারুস সুনান-১৪৪)

আর যে আসারে তাদের থেকে ‘রফয়ে ইয়াদাইন’ করা পাওয়া যায়, সেগুলো সহীহ নয়।

এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, পুরনো সাহাবা যাদের তাওহীদের বিশ্বাস মজবুত হয়ে গিয়েছিল, তাদের জন্য নামাযের ভিতর হাত তোলা নিষেধ হয়ে গেলেও যারা নতুন সাহাবা তাদের জন্য নামাযের ভিতরে হাত তোলা নিষেধ হয়নি, কারণ একদিকে তাদের নতুন মুসলমান হওয়ার কারণে বারবার শিরকের ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা আসত, কারণ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁরা অনেক দেব-দেবীর পূজা করতেন, অপরদিকে হাত তোলার অর্থ হচ্ছে: “আল্লাহ ব্যতীত যত বাতিল মাবুদ আছে সবই পিছনে ফেলে বাতিল করে দেওয়া।” এ কারণেই যখনই কোনো নওমুসলিম তার গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে দ্বীন শিখতে আসতেন, তখন তাদের শিরকের ওয়াসওয়াসা দূর করা শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের ভিতরে রুকুতে ও সিজদায় হাত তুলে দেখাতেন, যাতে প্রয়োজনে তারা এ পন্থায় শিরকের কুমন্ত্রণা দূর করতে পারেন, এটা শুধু তাদের সাথে সীমিত ছিল। এজন্য এটা দেখা সত্ত্বেও কোনো প্রবীণ সাহাবী নামাযের মধ্যে হাত তুলতেন না বা অন্যদের শেখাতেন না, কারণ তারা বুঝতেন যে এটা নতুন মুসলমানদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন এবং এটা সবার জন্য প্রযোজ্য নয়।

সারকথা হল: নামাযের মধ্যে রুকু-সিজদায় হাত তোলা নিষেধ হওয়া সত্ত্বেও নওমুসলিমদের তাওহীদ মজবুত হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য সাময়িকভাবে এটার অনুমতি ছিল, সুতরাং এখনো যদি কোনো নওমুসলিম এটা করতে চায় তাহলে তাকে নিষেধ করা হবে না, তবে পুরনো মুসলমানদেরকে এটা নিষেধ করা হবে, কারণ এটা তাদের জন্য আর প্রয়োজন নেই, এই সূক্ষ্ম কথাটি আহলে হাদীস বন্ধুগণ না বুঝতে পারায় ‘উধোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে’ চাপানোর ন্যায় নওমুসলিমদের আমল সব মুসলমানদের কাঁধে চাপাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন, আমীন।

তাছাড়া মালেক ইবনে হুয়াইরিস রা. এর হাদীসও তাদের দলীল হয় না। কেননা সেখানে সিজদা করার সময়ও রফয়ে ইয়াদাইনে কথা উল্লেখ আছে। অথচ তারা সিজদা করার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করে না।

আহলে হাদীস বন্ধুগণ সাধারণ মুসলমানদেরকে প্রভাবিত করার জন্য দাবি করে থাকেন যে, বারবার হাত তোলার হাদীস চার খলীফাসহ ২৫ জন সাহাবী থেকে প্রমাণিত আছে এবং তাদের হিসাবমতে বারবার হাত তোলার হাদীসের রাবীর সংখ্যা নাকি পঞ্চাশ-জন এবং এ ব্যাপারে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা একত্র করলে তার সংখ্যা হবে চারশত। তাদের এ দাবী সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। নিম্নে তাদের এই ভিত্তিহীন দাবীর খণ্ডন তুলে ধরা হলো:

(ক) তারা চার খলীফা সম্পর্কে দাবী করলেন যে, তাঁরা সকলেই নামাযের মধ্যে বারবার হাত তুলতেন। অথচ একটু পূর্বে আমরা দলীলসহ প্রমাণ করে এসেছি যে, চার খলীফার কেউ ‘রফয়ে ইয়াদাইন’ করতেন না। কাজেই তাদের দাবী গ্রহণযোগ্য নয়।

(খ) তারা ৫০ জন রাবী বা সাহাবীর ব্যাপারে দাবী করেছেন যে, ‘তাঁরা সবাই বারবার হাত তুলতেন’ তাদের এ দাবীও সম্পূর্ণ ভুল। মদীনাবাসী কোন সাহাবীই বারবার হাত তুলতেন না। আর কূফা নগরীতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদসহ ১৫০০ সাহাবা বসবাস করতেন, তাদের কেউ রুকু-সিজদার সময় হাত তুলতেন না। তাহলে তাদের এই ৫০ জন সাহাবী কারা ছিল?

আহলে হাদীসের ইমাম শাওকানী রহ. লিখেছেন যে, আল্লামা ইরাকী রহ. নামাযের শুরুতে রুকু-সিজদার ন্যায় হাত তোলার বর্ণনাকারী সাহাবাদের সংখ্যা গণনা করেছেন, তাদের সংখ্যা হল ৫০জন। এদের মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবাও রয়েছেন। এই একই কথা সানআনী রহ. “সুবুলুস সালাম:শরহ্ বুলুগিল মারাম” (১/২৭৪) গ্রন্থেও বলেছেন।

এর দ্বারা আহলে হাদীস বন্ধুদের ধোকা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ৫০জন সাহাবা যে হাত তোলার বর্ণনা করেছেন, তা শুধুমাত্র নামাযের শুরুতে হাত তোলার ব্যাপারে, নামাযের ভিতরে রুকু-সিজদার সময় হাত তোলার বর্ণনা তারা করেননি। খোদ আহলে হাদীসের এক ইমামের বর্ণনা থেকেই তা উঠে এসেছে। এরপরেও কোন মুখে তারা এ দাবী করেন যে, ৫০জন সাহাবী থেকে রুকু ও সিজদার সময় হাত তোলার প্রমাণ আছে? এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও প্রতারণামূলক একটি দাবী মাত্র।

(গ) তাদের তৃতীয় দাবী রফয়ে ইয়াদাইনের ব্যাপারে মোট হাদীসের সংখ্যা ৪০০। আমাদের প্রশ্ন: তাহলে ১৪০০ বছরের মধ্যে তারা এ ৪০০ হাদীস একত্র করে হাদীসের একটা সংকলন বের করলেন না কেন? তাদেরকে আরো সময় দেয়া হলো, তারা উক্ত হাদীসগুলোর সমন্বয়ে একটি কিতাব তৈরী করে উম্মতের সামনে পেশ করুক, যাতে উম্মত দেখতে পারে: আদৌ ৪০০ হাদীস আছে কিনা? বা থাকলে সেগুলোর হালত কী? আর যে দু-চারটি হাদীস তারা পেশ করবে তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য তাও বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। কারণ আহলে হাদীস বন্ধুদের

ব্যাপারে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আহমাদ শাকের রহ. লিখেছেন, ‘রফয়ে ইয়াদাইনের বিষয়ে এক শ্রেণীর লোক যঈফ হাদীসকে সহীহ সাব্যস্ত করার প্রয়াস পেয়ে থাকে, তাদের অধিকাংশ লোকেরা নীতি ও ইনসাফ বিসর্জন দিয়ে থাকেন।’ (জামে তিরমিযী-২/৪২)

ইমামের পিছনে মুকতাদীর সূরা ফাতেহা পড়ার বিধান

কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীসের আলোকে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, জামাআতের নামাযে ইমাম আস্তে কেরাআত পড়ুক বা জোরে কেরাআত পড়ুক মুকতাদী ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়বে না। যেমন মুকতাদী সূরা ফাতেহা ছাড়া অন্যকোনো সূরা বা আয়াত পড়ে না। নিম্নে এই মাসআলার সমর্থনে কুরআন মাজীদের আয়াত ও সহীহ হাদীস উল্লেখ করা হলো:

১ম দলীল: মুকতাদীর সূরা ফাতেহা এবং এর সাথে অন্যকোনো সূরা না পড়ার ব্যাপারে সবচেয়ে উত্তম ও উজ্জ্বল দলীল হলো কুরআন মাজীদের এই আয়াত-

واذا قرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ‘যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো। যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।’ (আল-আ-রাফ:২০৪) সাহাবায়ে কেরাম, তাবঈঈন, মুফাসসিরীন এবং মুহাদ্দিসীনে কেরামের স্পষ্ট বক্তব্য হল, এই আয়াত ইমামের পিছনে কেরাআত পড়া নিষেধ হওয়া সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর:২/২৮১, আল-মুগনী:১/৪৯০, আহকামুল কুরআন:৩/৩৯)

অতএব, এই আয়াতের হুকুম অনুযায়ী ইমাম জোরে কেরাআত পড়লে মুকতাদী চুপ করে মনোযোগ দিয়ে শোনবে। আর ইমাম আস্তে কেরাআত পড়লে মুকতাদী একেবারে নিশ্চুপ থাকবে। মুকতাদী সূরা-কেরাআত কিছুই পড়বে না।

২য় দলীল: আল্লাহ তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ‘যখন আমি কুরআন পাঠ করি তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করবেন’ (আল-কিয়ামাহ:১৮) এ আয়াতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত জিবরাঈল আ: এর তিলাওয়াতের অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন দেখুন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হুকুম কীভাবে পালন করেছেন, চুপ থেকে না জিবরাঈল আ. এর সাথে সাথে পড়ে? তিনি যা করেছেন মুকতাদীরও তাই করণীয়। ইমাম বুখারী রহঃ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, ‘আপনি এই কুরআন মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং চুপ থাকুন’ (সহীহ বুখারী হা. নং৫)

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যখন নামাযের বাইরে কুরআন তিলাওয়াতের সময় নিশ্চুপ থাকা ও মনোযোগ দিয়ে শোনার এত গুরুত্ব ও আদেশ তাহলে নামাযের ভিতরে এর গুরুত্ব ও আদেশ আরও বেশি তা সহজেই অনুমেয়।

৩য়: দলীল:

عن أبي موسى قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا، فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فاقموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا... الصحيح لمسلم (808):

হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নসীহত করলেন এবং সুন্নাহ তথা দ্বীনের পথ বাতলে দিলেন। আর বললেন: ‘যখন তোমরা নামায পড়তে শুরু কর তখন প্রথমে কাতার সোজা কর। এরপর একজন তোমাদের ইমাম হবে। সে যখন তাকবীর দেয় তখন তোমরাও তাকবীর দিবে এবং সে যখন কেরাআত পড়ে তখন তোমরা নিশ্চুপ থাকবে ...। (সহীহ মুসলিম হা.নং ৪০৪) উল্লেখ্য, সহীহ মুসলিমের এই হাদীসে স্পষ্টভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামের পিছনে কেরাআত পড়তে নিষেধ করেছেন।

৪র্থ দলীল:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا... سنن ابن ماجه (867):

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ‘জামাআতের নামাযে ইমাম হলো অনুসরণের জন্য। অতএব, ইমাম যখন আল্লাহু আকবার বলে তখন তোমরাও আল্লাহু আকবার বলবে। আর ইমাম যখন কেরাআত পড়ে তখন তোমরা চুপ থাকবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ হা.নং ৮৪৬) ইমাম মুসলিম রা. কে এই হাদীসের মান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘আমার মতে হাদীসটি সহীহ’ (সহীহ মুসলিম হা.নং ৪০৪) তাছাড়া ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং ইবনে হাযম রাহ.ও এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। (শরহ সুনানি ইবনে মাজাহ, মুগলতঙ্গ ৫/১৪৫২)

৫ম দলীল:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارى فأمنوا فان الملائكة تؤمن... صحيح البخارى (802):

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যখন কুরআন পাঠকারী (ইমাম) আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা ফেরেশতাগণও আমীন বলে থাকেন।’ (সহীহ বুখারী হা.নং ৭৮১) উল্লেখ্য, এই হাদীসে শুধু ইমামকে কুরআন পাঠকারী বলা হয়েছে, মুকতাদীকে

কুরআন পাঠকারী বলা হয়নি। এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, মুকতাদীগণ ইমামের পিছনে কুরআনের কোনো অংশ পাঠ করবে না।

৬ষ্ঠ দলীল:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال القارى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه: امين, فوافق قوله قول اهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. الصحيح لمسلم 850:

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যখন কুরআন পাঠকারী (ইমাম) বলে غير المغضوب عليهم এবং মুকতাদী বলে ‘আমীন’ তখন যার আমীন আসমানবাসীর আমীনের সাথে মিলে যায় তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।’ (সহীহ মুসলিম হা.নং ৪১০)

এই দুই হাদীসে জামাআতের নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ার বিধান নির্দেশিত হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো: এখানে শুধু ইমামকে কুরআন পাঠকারী বলা হয়েছে এবং মুকতাদীদেরকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, ইমাম যখন لا غير المغضوب عليهم বলে সূরা ফাতেহা শেষ করবে তখন মুকতাদীগণও ইমামের ‘আমীনের’ সাথে আমীন বলবে। তাদেরকে ফাতেহা পড়ে তারপর আমীন বলতে বলা হয় নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, শুধু ইমামই সূরা ফাতেহা পাঠ করবে, আর মুকতাদীরা চুপ থাকবে। ইমামের সূরা ফাতেহা পড়া শেষ হলে এবং তা শুনতে পেলে তখন মুকতাদীরা নিঃশব্দে আমীন বলবে।

৭ম দলীল:

عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. إتحاف الخيرة مع المطالب العالية , ٥٤٦٩:الموطأ محمد٥١٩:

হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়ে তার জন্য ইমামের কেরাআতই যথেষ্ট হবে। (ইতহাফুল খিয়ারাহ হাদীস নং ১৫৬৭, মুআত্তা মুহাম্মাদ হা.নং ১১৭, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম এবং আল্লামা বূসিরী রহ. এর মত প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমামগণ এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। (বিস্তারিত জানতে দেখুন ‘মুখতাসারু ইতহাফুস সাদাহ’ হাদীস নং ১৪৪০, ‘আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ’ হাদীস নং ১১৭)

এছাড়াও মুকতাদীর ইমামের পিছনে ফাতেহা না পড়ার ব্যাপারে আরো অনেক সহীহ হাদীস ও সাহাবায়ে কেরাম রা. এর ফাতওয়া রয়েছে। বেশি দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় এখানে শুধু দুইটি আয়াত ও কয়েকটি সহীহ হাদীস উল্লেখ করা হলো। এর দ্বারাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, ইমামের পিছনে জামাআতের নামাযে মুকতাদী সূরা ফাতেহা পড়বে না। আর ইমামের পিছনে মুকতাদীর সূরা ফাতেহা না পড়াই

সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবায়ে কেরাম এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে উম্মতের মত ও আমল। তারপরও আমাদের কিছু দ্বীনী ভাই যারা নিজেদেরকে ‘আহলে হাদীস’ বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন, তারা এই বিধানকে সহীহ হাদীসের খেলাফ মনে করেন এবং মুসলিম জনসাধারণকে একথা বলে বিভ্রান্ত করছেন যে, যারা ইমামের পিছনে ফাতেহা পড়ে না তাদের নামায হয় না।

এ ব্যাপারে আহলে হাদীস ভাইদের পেশকৃত দলীলের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নিম্নে পেশ করা হলো:

আহলুল হাদীস ভাইদের ১ম দলীল:

عن عبادة بن الصامت قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فنقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرأون وراء إمامكم، فقلنا: يا رسول الله إى والله، قال: فلا تفعلوا إلا بأمر القرآن فإنه لأصلوة لمن لم يقرأ بها. (وفى رواية البخارى: لأصلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.) الجامع للترمذى ٥١١، الصحيح للبخارى ٩٨٦:

হযরত উবাদা ইবনে সামের রা. বলেন, ‘একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ালেন, যাতে তার কেরাআতে খটকা লাগল। তিনি নামায শেষে বললেন, তোমরা বোধহয় আমার পিছনে কেরাআত পড়েছিলে? সাহাবীগণ বললেন, জী হাঁ। তখন তিনি বললেন, সূরা ফাতেহা ছাড়া এমন কাজ করো না। কেননা সূরা ফাতেহা ছাড়া নামায হয় না।’ (সুনানে তিরমিযী হা.নং ৩১১)

আহলুল হাদীস ভাইদের উপস্থাপিত দলীলগুলোর মধ্যে এই হাদীসটিই সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। এই দলীলের অবস্থা থেকে অন্যগুলোর অবস্থাও অনুমান করা যাবে। তাই আসুন এই হাদীস সম্পর্কে হাদীস বিশারদ ইমামদের মন্তব্য জেনে নেই:

১. ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ বলেছেন, হাদীস বিশারদ ইমামগণের দৃষ্টিতে এই হাদীস অনেক কারণে যঈফ। ইমাম আহমাদ এবং অন্যান্য ইমামগণ এই হাদীসকে যঈফ ও অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। (মাজমূআতু ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া ২৩/২৮৬)

২. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা নিমাজী রহঃ বলেন, হযরত উবাদা রা. এর সূত্রে কেরাআত পাঠের অসুবিধার যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়, তার সব কয়টি সনদই যঈফ। (আসারুস সুনান পৃ.১০১)

৩. প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ বিলুয়ী সুনানে তিরমিযীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘মাআরেফুস সুনানে’ এই হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন। যার সারকথা এই যে, এই হাদীসের সনদে আট ধরনের এবং মতনে তের ধরনের ইযতিরাব বা সমস্যা রয়েছে। তাই এই হাদীসটি যঈফ বা অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হয়। (মাআরিফুস সুনান ৩/২০২)

৪. আহলুল হাদীস ভাইদের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব মরহুম নাসিরুদ্দিন আলবানী এই হাদীস সম্পর্কে বলেন, এই হাদীসের বিধান রহিত হয়ে গেছে। (সিফাতু সালাতিন নাবিয়্যি পৃ.৯৩)

মোটকথা এ ধরনের হাদীসকে অবলম্বন করে কুরআন এবং সহীহ হাদীসের বিপরীত হুকুম দেয়া যায় না এবং কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনা ত্যাগ করা যায় না।

তাদের ২য় দলীল

হযরত উবাদা ইবনে সামের রা. এর সূত্রে বর্ণিত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পড়ে না তার নামায হয় না।’ (সহীহ বুখারী হা.নং ৭৫৬)

পর্যালোচনা:

ক. এই হাদীসটি সহীহ, কিন্তু এর বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়। কারণ ফাতেহা না পড়লে নামায হবে না এই বিধান ইমাম, একাকী নামায আদায়কারী, মুকতাদী, নাকি ইমাম-মুকতাদী সবার জন্য তা এই হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। তাই সুস্থ জ্ঞানের দাবি হলো এই যে, এই হাদীসের ব্যাখ্যা বা মর্ম সাহাবায়ে কেরাম রা. এবং হাদীস বিশারদ ইমামদের থেকে জেনে সে অনুযায়ী আমল করা। সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে হযরত জাবের রা. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এই হাদীসের হুকুম একাকী নামায আদায়কারীর জন্য প্রযোজ্য। আর ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ., ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী রহ. হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ ফাতেহা ছাড়া নামায না হওয়ার হাদীসটি একাকী নামায আদায়কারীর জন্য প্রযোজ্য। মুকতাদীর জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য নয়। আমরা হানাফীরা সাহাবা এবং মুহাদ্দিস ইমামদের থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীসের এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমল করি। তাহলে আমাদের আমলকে কীভাবে হাদীস পরিপন্থী বা ভুল বলা যেতে পারে? (জামে তিরমিযী হা.নং ৩১২, সুনানে আবু দাউদ হা.নং ৮২২)

খ. এই হাদীসের অনেকগুলো সনদে فمأزاد, فصاعدا ইত্যাদি শব্দ রয়েছে। সে হিসেবে হাদীসের অর্থ হয় ‘যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা ও তার সাথে অন্য একটি সূরা বা কিছু আয়াত পড়ে না তার নামায হয় না।’ (এই বর্ণনা দ্বারাও বুঝা যায় যে, এই হাদীসটি ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্য, মুকতাদীর জন্য নয়।) সহীহ মুসলিম হা. নং ৩৯৪

অথচ আহলুল হাদীস ভাইয়েরা বলেন, মুকতাদী শুধু সূরা ফাতেহা পড়বে, ফাতেহা ছাড়া অন্য কিছু পড়বে না। হাদীসটি যদি জামাআতে নামায আদায়কারী মুকতাদী সম্পর্কেই হয়ে থাকে, তাহলে পূর্ণ হাদীসটির উপরই আমল করে ইমামের পিছনে মুকতাদীর সূরা ফাতেহা পড়া ছাড়াও আরো একটি সূরা বা কিছু আয়াত তিলাওয়াত

করা উচিত। এবং হাদীস বর্ণনার সময় বিশ্বস্ততার সাথে পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করা উচিত। অথচ তারা পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করে না এবং মুকতাদীকে সূরা মিলানোর নির্দেশও দেন না। (সহীহ মুসলিম:৩৯৪)

গ. সাহাবা কেরাম ও মুহাদ্দিস ইমামগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই হাদীসের বিধান ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর সাথে খাস না করে যদি মুকতাদীকেও ইমামের পিছনে ফাতেহা পড়তে বলি, তাহলে পূর্বোল্লিখিত কুরআনের আয়াত ও অনেক সহীহ হাদীসের সাথে এই হাদীসের স্পষ্ট সংঘর্ষ বেঁধে যায়। আর সংঘর্ষ দূর করার জন্য অনেক অজুহাতের অবতারণা করা হয়ে থাকে, কিন্তু তারপরও সংঘর্ষ দূর হয় না। শেষ ফলাফল এই হয় যে, একটি হাদীসের অর্থ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কুরআনের একাধিক আয়াত ও অনেকগুলো স্পষ্ট সহীহ হাদীসের বিরোধিতা করতে হয়। অথচ হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা একাকী নামায পড়া অবস্থায় এই হাদীসের উপর আমল করছে, আর ইমামের পিছনে নামায পড়া অবস্থায় কুরআনের একাধিক আয়াত ও একাধিক সহীহ হাদীসের উপর আমল করছে। তারপরও তাদের আমলকে হাদীস বিরোধী বলে সাধারণ মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এটা বড়ই দুঃখের বিষয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

সূরা ফাতেহা শেষে “আমীন” আস্তে বলা সুন্নত

হানাফী মাযহাব মতে নামাযে ইমাম, মুক্তাদি, মুনফারিদ সকলের জন্যই “আমীন” বলা সুন্নত, এবং সকলের জন্য “আমীন” আস্তে বলা আরেকটি সুন্নত। যেহেতু নামাযে “আমীন” বলা সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন মতবিরোধ নেই, এজন্য এটাকে দলীল দিয়ে প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের আলোচনা হলো “আমীন” আস্তে বলা সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে।

এক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের জানতে হবে, সকলের নিকট এটা স্বীকৃত যে, সূরা ফাতেহা শেষে “আমীন” হলো একটি দু‘আ, আর দু‘আ আস্তে করা মুস্তাহাব। আমরা এর কিছু প্রমাণ পেশ করছি।

(১) قال الله في القرآن المجيد: قال قد أجيب دعوتكما فاستقيما... الخ الآية سورة يونس: ৮৯:

তরজমা: আল্লাহ তা‘আলা (হযরত মূসা আ. ও হযরত হারুন আ. এর দু‘আর জওয়াবে) বললেন, তোমাদের দু‘আ কবুল হল। সুতরাং তোমরা দৃঢ়পদ থাক। (সূরা ইউনুস:৮৯)

(২) عن أبي هريرة قال: كان موسى إذا دعا أمن هارون على دعائه يقول آمين فذلك قوله: قد أجيب دعوتكما. (الدر المنثور ৩৪৭/৪):

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, যখন হযরত মুসা আ. দু‘আ করতেন তখন হযরত হারুণ আ. তার দু‘আর উপর “আমীন” বলতেন। قد أجيب دعوتكما द्वारा এটাই বুঝানো হয়েছে। (দ্রঃ মানসূর:৪/৩৪৭)

(৩) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطاني التأمين ولم يعطه أحدا من النبيين قبلي إلا أن يكون الله قد أعطا هارون يدعو موسى ويؤمن هارون.
(صحيح ابن خزيمة(১৫৮৬):

অর্থ: হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা (দু‘আর স্থলে) “আমীন” (এর নিআমাত) একমাত্র আমাকেই দিয়েছেন, আমার পূর্বে আর কোন নবীকে দেননি, তবে শুধু হারুণ আ. কে দিয়েছিলেন। হযরত মুসা আ. দু‘আ করতেন আর হযরত হারুণ আ. শুধু “আমীন” বলতেন। (সহীহ ইবনে খুযাইমাহ্: হা.১৫৮৬)

(৪) قال الله: أدعوا ربكم تضرعا وخفية, إنه لا يحب المعتدين .

অর্থ: তোমরা বিনীতভাবে ও চুপিসারে তোমাদের প্রতিপালক এর নিকট দু‘আ কর, নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আ‘রাফ:৫৫)

(৫) وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين .

অর্থ: তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর (দু‘আ ও জিকির কর) সকালে ও সন্ধ্যায়, মনে মনে, বিনয় ও ভীতির সাথে, এবং মুখে অনুচ্চস্বরে। যারা গাফলতিতে নিমজ্জিত, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (সূরা আরাফ:২০৫)

(৬) وقال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا .

অর্থ: এটা সেই রহমতের বর্ণনা, যা তোমার প্রতিপালক নিজ বান্দা যাকারিয়ার প্রতি করেছিলেন, যখন সে নিজ প্রতিপালককে ডেকেছিল চুপিসারে। (সূরা মারইয়াম:২-৩)

(৭) عن أبي موسى الأشعري قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذين تدعونهم سميع قريب.
(تفسير ابن كثير(২২১/২):

তরজমা: হযরত আবু মুসা আশ‘আরী রা. বলেন, একদা সাহাবায়ে কিরাম রা. জোরে জোরে দু‘আ করছিলেন তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে লোক সকল! আস্তে (দু‘আ কর), তোমরাতো এমন কাউকে ডাকছ না, যিনি শোনে

না অথবা তোমাদের থেকে দূরে, তোমরা যাকে ডাকছ তিনি তোমাদের অতি নিকটে এবং সব কথা শোনেন। (তফসিরে ইবনে কাসির:২/২২১)

উল্লেখ্য যে, ১নং এর আয়াত, ২নং ও ৩নং এর হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, “আমীন” এটি একটি দু‘আ। আর ৪নং ৫নং ও ৬নং এর আয়াত এবং ৭নং এর হাদীস দ্বারা এটাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ তাআলা দু‘আ করতে শিখিয়েছেন; বিনীতভাবে, চুপিসারে, মনে মনে, ভীতির সাথে, ও অনুচ্চস্বরে।

অতএব সূরা ফাতেহা শেষে “আমীন” বলার ক্ষেত্রে ঠিক এই শিক্ষাটিই মানতে হবে। আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও এমনই শিক্ষা দিয়েছেন।

এ পর্যায়ে নামাযে সূরা ফাতেহা শেষে “আস্তে আমীন” বলার ব্যাপারে হাদীস শরীফ থেকে আরও কিছু স্পষ্ট দলীল পেশ করছি।

(১) عن وائل بن حجر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال آمين. وأخفى بها صوته .

وفي رواية: وخفص بها صوته. (رواه الترمذی: ২৪৮, وأحمد, ৩১৬/৪, وحاكم في المستدرک: ২৯১৩ قال الذهبي: على شرط البخاری ومسلم .)

অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন। তিনি যখন (غیر المغضوب عليهم ولا الضالین) বললেন, তখন “আমীন” বললেন এবং “আমীন” বলার সময় তাঁর আওয়াজকে নিচু করলেন। (তিরমিযী শরীফ হা.নং ২৯০, মুসনাদে আহমাদ ৪/৩১৬, মুসতাদরাকে হাকেম হা.নং ২৯১৩)

(২) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন (غیر المغضوب عليهم ولا الضالین) বলে, তখন তোমরা “আমীন” বল। কেননা যে ব্যক্তির “আমীন” বলা ফিরিশতাদের “আমীন” বলার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। (বুখারী শরীফ হা.নং ৭৮২, মুসলিম শরীফ হা.নং ৪১০) আর এ কথা সকলেই মানতে বাধ্য যে, ফিরিশতারা আমীন আস্তে বলে। কারণ, তাদের আমীন কেউ শুনতে পায় না। তাই শতভাগ এই হাদীসের উপর আমল করতে চাইলে অনুচ্চ স্বরে-আস্তে আমীন বলতে হবে।

وفي رواية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: إذا قال الإمام ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ فقولوا آمين. فان الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه .

(رواه احمد ٥/٥٧٥:واين حبان, ٥٨٠٨:والدارمي, ٥٨٨٦:والنسائي(٥٨٩:

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে আরেক বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন ইমাম (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) বলবে, তখন তোমরা “আমীন” বলবে। ফিরিশতারাও তখন “আমীন” বলে এবং ইমামও তখন “আমীন” বলে। সুতরাং যার “আমীন” ফিরিশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। (সুনানে নাসাঈ হা.নং ৯২৭, আহমাদ ২/৩৩৩, ইবনে হিব্বান হা.নং ১৮০৪)

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হাদীসের প্রথম অংশ যা বুখারীর বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে এর দ্বারা “আমীন” বলার স্থান ও সময় বুঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশ যা ইবনে হিব্বান ও দারেমীর বর্ণনায় রয়েছে অর্থঃ: فان الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول ‘ফিরিশতারাও তখন “আমীন” বলে এবং ইমামও তখন “আমীন” বলে’ এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে “আমীন” এর অবস্থা তথা আস্তে “আমীন” বলা। ইমামের জোরে বলা উদ্দেশ্য হলে এই অংশটি বাড়িয়ে বলার কোন অর্থ হয় না। তাছাড়া ফিরিশতাদের সাথে তাদের মত “আমীন” বলতে হবে, আর তারা তো আস্তে “আমীন” বলেন, সুতরাং আমাদেরও আস্তে “আমীন” বলতে হবে।

(٥) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله يعلمنا يقول: لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا, وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين, وإذا ركع فاركعوا, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. (رواه مسلم 855:

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শেখাতেন। তিনি বলতেন, ইমামের পূর্বে কিছু কর না। যখন ইমাম তাকবীর বলবে, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। ইমাম যখন ولا الضالين পড়ে শেষ করবে, তখন তোমরা “আমীন” বলবে। ইমাম যখন রুকু করবে তোমরাও তখন রুকু করবে। আর ইমাম যখন سمع الله لمن حمده বলবে, তখন তোমরা اللهم ربنا لك الحمد বলবে। (মুসলিম শরীফ হা. নং ৪১৫)

এই হাদীসে মুক্তাদির জন্য তিনটি জিনিস বলার নির্দেশ এসেছে। তাকবীর, “আমীন”, আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্দ। প্রথম ও তৃতীয়টি সকলের মতে আস্তে বলতে হবে। তাহলে বর্ণনার পূর্বাপর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় নির্দেশটিও আস্তে পালন করবে। সুতরাং “আমীন” আস্তেই বলতে হবে।

(৪) عن الحسن أن سمرة بن جندب و عمران بن حصين تذاكرا فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتين, سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حصين, فكتبنا في ذلك إلى أبي بن كعب, فكان في كتابه أو في رده عليهما أن سمرة قد حفظ. (رواه احمد, ২৩/৫:২৫১; وابو داود ৪৮০):

অর্থ: হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব ও হযরত ইমরান ইবনে হাসীন রা. পরস্পর আলোচনা হলো। হযরত সামুরা রা. হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, আমার স্মরণ আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি স্থানে সাক্তাহ করতেন অর্থাৎ চুপিসারে পড়তেন। একটি তাকবীরে তাহরীমা বলার পর অর্থাৎ সানা। দ্বিতীয়টি (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) “আমীন”। হযরত ইমরান ইবনে হাসীন রা. দ্বিতীয়টির স্বীকৃতি দিলেন না। তখন উভয়ে এই মাসআলা জানার জন্য হযরত উবাই ইবনে কা‘আব রা. এর নিকট পত্র লিখেন। হযরত উবাই ইবনে কা‘আব রা. লেখেন, সামুরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিষয়টি সঠিকভাবেই স্মরণ রেখেছে। (তিরমিযী হা. নং ২৫১, সুনানে আবু দাউদ হা. নং ৪৮০, মুসনাদে আহমাদ ৫/২৩)

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সানা আস্তে পড়তেন এ ব্যাপারে উভয় সাহাবী একমত হয়ে গেলেন, কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহার পরে “আমীন” বলতেন কি না এ ব্যাপারে তাদের মতবিরোধ হল, একজন বলছেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “আমীন” বলতেন অন্যজন তা অস্বীকার করলেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “আমীন” সর্বদা আস্তে বলতেন। কারণ আওয়াজ করে বললে দু’জন সাহাবার মধ্যে ঐ ব্যাপারে কখনো মত পার্থক্য হতো না। অতএব এর দ্বারা বুঝা গেল যে, “আমীন” আস্তে বলাটাই আসল আমল।

(৫) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمر بن الخطاب: يخفى الإمام أربعاً: التعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين وربنا لك الحمد. (الحلى بالاثار ২৮০/২):

অর্থ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলা বলেন, হযরত উমর রা. বলেছেন, ইমাম চারটি জিনিস নিঃশব্দে পড়বে। আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, “আমীন” ও রাক্বানা লাকাল হামদ। (আল-মুহালা বিল আসার ২/২৮০)

(৬) عن علقمة و الأسود كلاهما عن عبد الله بن مسعود قال: يخفى الإمام ثلاثاً: الاستعاذة, وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين. (الحلى ২৮০/২):

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম তিনটি জিনিস নিঃশব্দে বলবে। আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, “আমীন”। (আল-মুহালা বিল আসার ২/২৮০)

এ পর্যায়ে উক্ত মতের বিরোধীদের দলীল ও তার খণ্ডন এবং তার জওয়াব উল্লেখ করছি।

জোরে “আমীন” বলা সম্পর্কিত হাদীসগুলি সম্পর্কে মূল কথা হল, যেটি সহীহ, সেটি (صريح) দাবী প্রমাণে সুস্পষ্ট নয়। আর যেটি সুস্পষ্ট (صريح) সেটি সহীহ নয়। যেমন:-

যারা জোরে “আমীন” বলার কথা বলেন, তারা তাদের দাবীর পক্ষে সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী দলীল পেশ করে থাকেন ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. এর নিম্নোক্ত হাদীস দু’টি দিয়ে।

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. (رواه البخارى, ٩٧٥٠: ومسلم ٩١٨)

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন “আমীন” বলে তখন তোমরাও “আমীন” বল। কেননা যার “আমীন” ফিরিশতাদের আমীনের সাথে মিলে যায়, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। (বুখারী শরীফ হা.নং ৭৮০, মুসলিম শরীফ হা.নং ৯১৪)

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) বলে, তখন তোমরা “আমীন” বল। কেননা যার “আমীন” ফিরিশতাদের আমীনের সাথে মিলে যায়, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। (বুখারী শরীফ হা.নং ৭৮২, মুসলিম শরীফ হা.নং ৪১০)

প্রথম হাদীসটি দ্বারা ইমাম বুখারীসহ অনেকে ইমামের জোরে “আমীন” বলা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তারা এর অর্থ করেছেন, “ইমাম যখন শুনিye “আমীন” বলবে (যা হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই), তখন তোমরাও “আমীন” বলো” কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রথম কথা হল, হাদীসটির শুধু একটিই অর্থ নয়, আরো অর্থ হতে পারে। হাদীসটিতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, কিন্তু এর কোন নির্ধারিত অর্থ কারো কাছে বলে যাননি। ইমাম মালেক রহ. বংশগতভাবেই আরবী ভাষী এবং মদীনার অধিবাসী ছিলেন, মালেকী মাযহাব মতে ইমাম “আমীন”ই বলবে না। তারা

এই হাদীসের অর্থ করেছেন, ‘ইমাম যখন “আমীন” বলার স্থানে পৌঁছবে। তখন তোমরা “আমীন” বলা’ আবার অনেকে হাদীসটির অর্থ করেছেন, ‘যখন ইমাম “আমীন” বলতে ইচ্ছে করবে, তখন তোমরা “আমীন” বলবে’। কেননা ইমাম মুকতাদী ও ফিরিশতার “আমীন” একসাথে হওয়া কাম্য।

অর্থাৎ এই হাদীস দ্বারা মূলত “আমীন” বলার পদ্ধতি তথা জোরে বা আস্তে বলার বর্ণনা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা আমীনের ফযীলত বুঝানো উদ্দেশ্য যে, ইমাম যখন “আমীন” বলার ইচ্ছা করবে, তখনই তোমরা “আমীন” বলবে। যাতে তোমাদের “আমীন” ইমাম ও ফিরিশতাদের আমীনের সাথে মিলে যায়, এবং তোমরা অতীতের সব গুনাহ মার্ফের ফযীলতে ধন্য হতে পার।

“আমীন” বলার পদ্ধতি হলো আস্তে বলা, এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসটিতে। যা একটি বড় হাদীসের এক অংশ মাত্র। হাদীসটিতে নামাযের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং ইমাম মুকতাদীর কাজ ভিন্ন ভিন্ন করে বুঝানো হয়েছে, যা আমরা আমাদের ৩নং দলীলে উল্লেখ করেছি। মূল হাদীসের পূর্বাপর থেকে এটাই বুঝা যায় যে, মুকতাদী ইমামের পেছনে যেকোন তাকবীর ও তাহমীদ (ربنا لك الحمد) আস্তে বলতে হয়, সেরূপ “আমীন”ও আস্তেই বলবে। ভিন্ন কোন দলীল ছাড়া জোরে বলার অবকাশ নেই।

আর দ্বিতীয় কথা হল, যদি প্রথম অর্থটিই ধরা হয়, তবুও জোরে “আমীন” বলার ব্যাপারে এর নির্দেশনা সুস্পষ্ট নয়, এবং এমন হওয়াও সম্ভব নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেক হাদীসে বলেন, فان الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين ‘ফিরিশতারাও তখন “আমীন” বলে এবং ইমামও তখন “আমীন” বলে’ পূর্বে বর্ণিত হাদীস দুটিতে যদি জোরে “আমীন” বলা বুঝানো হতো, তাহলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি ভিন্ন করে বলার কোন প্রয়োজন হয় না। এ কথাটি ভিন্ন করে বলাই বুঝায় যে, ইমাম ও ফিরিশতাদের “আমীন” আস্তে হয়ে থাকে। অতএব মুকতাদীদেরকে ফযীলত পেতে হলে তাদের সাথে মিল রেখে “আমীন” আস্তেই বলতে হবে।

জোরে “আমীন” বলার পক্ষে আরেকটি দলীল পেশ করা হয়, তিরমিযী শরীফের একটি হাদীস দিয়ে। হাদীসটি হলো:-

عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ فقال آمين، ومد بها صوته. وفي رواية أبي داود بلفظ: فقال آمين، ورفع بها صوته. (رواه الترمذی، ۨ8ۮ: ۨ8ۮ; وابو داود ۨ۩۩)

তরজমা: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়লেন, ولا (غير المغضوب عليهم ولا)

(الضالين) অতঃপর বললেন, “আমীন” এবং “আমীন” বলার সময় তাঁর আওয়াজকে লক্ষ্য করলেন। সুনানে আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে: ‘নবীজি “আমীন” বলার সময় তাঁর আওয়াজকে উঁচু করলেন’। (তিরমিযী শরীফ হা.নং২৪৮, আবু দাউদ হা.নং৯৩২)

আল্লামা ইবনুল হুমাম সহ অনেকে বলেন যে, জোরে “আমীন” বলার এ হাদীস মূলত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে, প্রকৃত ও স্থায়ী আমল হলো, আন্তে “আমীন” বলা। যেমন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো সিররী নামাযে এক দুই আয়াত জোরে পড়তেন, হযরত ওমর রা. কখনো কখনো “সানা” জোরে পড়তেন, হযরত আবু হুরাইরা রা. কখনো কখনো اعوذ بالله জোরে পড়তেন, এবং এ সব ছিলো মুসল্লিদেরকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। এছাড়া এর আরেকটি স্পষ্ট প্রমাণ হলো যে, হযরত ওয়াইল বিন হুজর ইয়ামানবাসী সাহাবী ছিলেন, তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে দ্বীন শিক্ষা করার লক্ষ্যেই এসেছিলেন, তিনি ২০দিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সোহবতে ছিলেন এবং ষাট ওয়াক্ত জোরে ক্বিরাতওয়ালা নামায পড়েছিলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ঠিক পেছনে তার জন্য স্থান নির্বাচন করে দিয়েছিলেন। ওয়াইল বিন হুজর বলেন, এই ষাট ওয়াক্তের মধ্যে সাতান্ন ওয়াক্তে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন্তে “আমীন” বললেন এবং মাত্র তিন ওয়াক্ত নামাযে “আমীন” জোরে বলেছিলেন, তো আমার বুঝতে বাকী ছিল না যে, এটা আমাকে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যেই করেছিলেন।

(আল আসমাউ ওয়ালকুনা:১/১৯৭, মাজমাউজ যাওয়াইদ:২/১১৩, নাসাঈ হা.নং ৯৩২, শরহুল মাওয়াহিব:৭/১১৩, শরহে বুখারী দূলাবী প্রণীত।)

অনুরূপ জোরে “আমীন” বলাই যদি নবীজি এর সুন্নত হতো, তাহলে হাদীসের মধ্যে এর অনেক অনেক বর্ণনা রয়েছে যেতো এবং আমলের ক্ষেত্রেও সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়তো, কেননা এটি একটি করণীয় আমল, বর্জনীয় আমল হলে সে ক্ষেত্রে বর্ণনা কম হওয়ার সুযোগ থাকে। অথচ এবিষয়ে সমাধানের জন্য খাইরুল কুরুনে প্রচলিত আমলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আল্লামা ইবনুত তুরকুমানী রহ. বলেন, অধিকাংশ সাহাবা ও তাবেঈনদের আমল ছিলো আন্তে “আমীন” বলা। (মাআরিফুস-সুনান:২/৪১৮, সুনানে বাইহাকী (টিকা): ২/৮৫)

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে বুঝার এবং আমল করার তাওফিক দান করুন। “আমীন”।

রুকু থেকে সিজদায় যাওয়ার সুন্নাত

কওমা তথা রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সিজদায় যাওয়ার সুন্নাত তরীকা নিয়ে ফুকাহায়ে কেরাম এর মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য থাকলেও এটা নিয়ে এক পক্ষ অন্য

পক্ষের সাথে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি করে না। আর এটা বাড়াবাড়ি করার মত কোনো বিষয়ও নয়। এতদসত্ত্বেও এ বিষয়ে কলম ধরতে হচ্ছে আহলে হাদীস বা লা-মায়হাবী ভাইদের কল্যাণে (?)। আমরা নিজে রুকু থেকে সিজদায় যাওয়ার পক্ষে-বিপক্ষের দলীল তুলে ধরে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণ করে দেখাব যে, এ ক্ষেত্রে হানাফীদের আমলই হাদীস ও আসারে সাহাবা দ্বারা সু-প্রমাণিত আহলে হাদীস ভাইয়েরা যে হাদীসের উপর ভিত্তিকরে হানাফীদের বিপরীত আমল করে সেটা বিভিন্ন কারণে গ্রহণযোগ্য নয়।

কওমা থেকে সিজদায় যাওয়ার সুনাত তরীকার ব্যাপারে ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনে কেরামের দুই ধরনের মতামত রয়েছে।

১.রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দুই হাঁটু জমিনে রাখবে এরপর দুই হাত সিজদার স্থানে রাখবে। আর সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় প্রথমে হাত জমি থেকে উঠাবে এরপর হাঁটু জমি থেকে তুলবে।

২.রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দুই হাত জমিনে রাখবে এরপর দুই হাঁটু জমিনে রাখবে। আর সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় প্রথমে হাঁটু জমি থেকে উঠাবে এরপর দুই হাত জমি থেকে তুলবে।

প্রথমোক্ত মতের প্রবক্তাগণ :

হানাফী মায়হাবে প্রথম মত গ্রহণ করা হয়েছে। হানাফী মায়হাবের মতামত আরও যাদের থেকে বর্ণিত তারা হলেন, সাহাবায়ে কেরাম রা. এর মধ্য থেকে: হযরত উমর রা. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হযরত আনাস রা. হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা.। তবেঈ এবং তাবয়ে তাবেঈনদের মধ্য থেকে: ইবরাহীম নাখরী, ইবনে সীরীন, আবু কিলাবাহ, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ, ইমাম ইসহাক বিন রাহুয়া, সুফিয়ান সাওরীসহ আরও অনেক ফকীহ ও মুহাদ্দিস রহিমাহুমুল্লাহ। ইমাম তিরমিযী রহ. এর ভাষ্যানুযায়ী ‘অধিকাংশ ফুকাহা ও মুহাদ্দিস প্রথম মতের প্রবক্তা এবং তারা এ অনুযায়ী আমল করে আসছেন।’ (সুনানে তিরমিযী হা.নং ২৬৮, আল মুগনী ইবনে কুদামাহ:১/৩০৩, যাদুল মাআদ:১/২১৫, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা:১/২৬৯ শামেলা)

দ্বিতীয় মতের প্রবক্তা: বর্তমান যমানার আহলে হাদীস (লা-মায়হাবী) নামধারী ফেরকা এই মত গ্রহণ করেছে।

প্রথমোক্ত মত তথা রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দুই হাঁটু জমিনে রাখবে এরপর দুই হাত সিজদার স্থানে রাখবে। আর সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় প্রথমে হাত জমি থেকে উঠাবে এরপর হাঁটু জমি থেকে তুলবে। এর স্বপক্ষে-

হানাফীদের দলীল:

(১) عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.

‘হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. বলেন, আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদায় যাওয়ার সময় দুই হাতের পূর্বে দুই হাঁটু জমিনে রাখতে দেখেছি এবং ওঠার সময় দুই হাঁটুর পূর্বে দুই হাত জমিন থেকে ওঠাতে দেখেছি।’ (সুনানে আবু দাউদ হা.নং৮৩৮, সুনানে তিরমিযী হা.নং ২৬৮, সুনানে দারেমী হা.নং ৩০৩, সহীহ ইবনে খুযাইমা হা.নং ৬২৬, মা‘রেফাতুস সুন্নান ওয়াল আসার বাইহাকী : ৩/৬৪ শামেলা) এই হাদীসের সনদকে ইমাম তিরমিযী এবং হাকেম নিশাপুরী যথাক্রমে হাসান এবং সহীহ বলেছেন। ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়া রহ.ও এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। সুনানে দারেমীতে হাদীসটিকে হাসান বলা হয়েছে। (ফাতহুল বারী কিতাবুল ঈমান:৬/৫৩, যাদুল মাআদ:১/২১৬ শামেলা)

(২) عن سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين .

‘হযরত সা‘দ রা. থেকে বর্ণিত, আমরা এক যমানায় সিজদায় যাওয়ার সময় হাঁটুর আগে হাত রাখতাম, এরপর আমাদেরকে হাতের পূর্বে হাঁটু রাখতে আদেশ করা হয়েছে।’ (সহীহ ইবনে খুযাইমা:৩/৩১৮)

(৩) عن أبي هريرة يرفعه أنه قال إذا سجد أحدكم فليبتدئ بركبتيه قبل يديه ولا يترك بروك الفحل.

আবু হুরাইরা রা. বলেন, নবীজি জ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সিজদা করে তখন প্রথমে যেন দুই হাঁটু জমিনে রাখে, পুরুষ (উট) এর মত যেন না বসে, (অর্থাৎ আগে যেন হাত না রাখে, কারণ এটাই উটের বসার নিয়ম)।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা:১৩/৪৮৬ শামেলা)

এসব হাদীস দ্বারা রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সিজদায় যাওয়া এবং সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সুন্নাত তরীকার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের মতামত দৃঢ়ভাবে সঠিক ও বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলো। এতদসত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে লা-মাযহাবী ভাইদের হানাফী মাযহাব ছেড়ে অন্য মতামত গ্রহণ করা সমাজে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে তাদের দলীল ও তার খণ্ডন নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

লা-মাযহাবীদের দলীল:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يترك بروك البعير.

‘হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সিজদা করে তখন সে যেন দুই হাঁটুর পূর্বে দুই হাত জমিনে রাখে। আর উটের মত যেন না বসে।’ (সুনানে নাসাঈ হা.নং ১০৯০, সুনানে আবু দাউদ হা.নং ৮৪০, হাদীসটি হাদীসের আরও অন্যান্য কিতাবে আছে)

হাদীসটির সনদ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ মিশ্র-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন: কেউ হাসান, কেউ সহীহ, কেউ যযীফ বলে মন্তব্য পেশ করেছেন। কেউ মুনকারও বলেছেন। যেমন হামযাহ আল-কেনানী রহ. এই হাদীসকে মুনকার বলেছেন। (ফাতহুল বারী কিতাবুল ঈমান:৬/৫৩)

তবে প্রথমোক্ত হাদীসটি দ্বিতীয়োক্ত হাদীসের উপর অন্য কয়েকটি কারণে প্রাধান্য পায়। কারণগুলো ‘যাদুল মা‘আদ’ গ্রন্থ থেকে নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. লা-মায়হাবীদের হাদীসটিকে সা‘দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীসের কারণে অনেক মুহাদ্দিস মানসূখ (রহিত) বলেছেন। যেমন ইবনুল মুনিয়র রহ. বলেন, ‘আমাদের মায়হাবের অনেক ফুকাহা এই হাদীসটিকে মানসূখ মনে করেন।’ (যাদুল মাআদ:১/২১৫) তাছাড়া সহীহ ইবনে খুযাইমার সংকলকও এই হাদীসটিকে মানসূখ বলেছেন। (সহীহ ইবনে খুযাইমা:৩/৩১৮) আর ফুকাহায়ে কেরাম এবং মুহাদ্দিসীন হযরাত এ ব্যাপারে একমত যে, মানসূখ হাদীস কোনো আমলের স্বপক্ষে দলীল হতে পারে না। অতএব, লা-মায়হাবী ভাইয়েরা হযরত আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস দ্বারা তাদের আমলের পক্ষে যে দলীল পেশ করছে সে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সেটা মানসূখ অর্থাৎ রহিত হয়ে গেছে।

২. যদি আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত লা-মায়হাবীদের হাদীসটিকে মানসূখ নাও মানা হয়, তাহলে এটার ‘মতন মুযতারিব’। অর্থাৎ হাদীসের মূল পাঠ উলটপালট হয়ে গেছে। কারণ হাদীসের প্রথম অংশে যে কাজ করতে বলা হয়ে দ্বিতীয় অংশে সেটাই নিষেধ করা হয়েছে। এভাবে যে, হাদীসের প্রথম অংশে দুই হাঁটুর পূর্বে দুই হাত রাখতে বলা হয়েছে, আর দ্বিতীয় অংশে উটের মত বসতে নিষেধ করে মূলত হাঁটুর পূর্বে হাত রাখতেই নিষেধ করা হয়েছে। কেননা উট বসার সময় প্রথমে হাত তথা সামনের দুই পা জমিনে বিছায় এরপর পিছনের দুই পা বিছিয়ে বসে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর থেকে বর্ণিত মতনই সঠিক। আমাদের বর্ণিত তিন নং দলীলে খোদ হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, যা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় লা-মায়হাবীগণ আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে হাদীসটিকে দলীল হিসেবে পেশ করেছে, সেটা বর্ণনা করার সময় কোনো বর্ণনাকারী ভুল বশত শব্দ আগ-পিছ করে ফেলেছে। এ হিসাবে আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস (যেটা লা-মায়হাবীদের দলীল)-এর মূল-পাঠ আসলে এমন ছিল:

إذا سجد أحدكم فليضع ركبتيه قبل يديه ولا يترك بركه البعير

‘তোমাদের কেউ যখন সিজদা করে তখন সে যেন নিজ দুই হাঁটু দুই হাতের পূর্বে রাখে এবং উটের মত যেন না বসে।’

হাদীসের মূল-পাঠ এমন ধরা হলে, হাদীসের প্রথম অংশ এবং দ্বিতীয়াংশের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ হয় না এবং আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত দুই হাদীস একটি আরেকটির বিপরীত হয় না।

এসব আলোচনা দ্বারা, প্রমাণিত হলো, লা-মাযহাবী ভাইদের দলীলটি ‘মুযতারিবুল মতন’ বা ‘মাকলুব’। আর মুযতারিব হাদীস দলীল হওয়ার উপযুক্ত নয়। ফলে রুকু থেকে সিজদায় যাওয়ার ব্যাপারে লা-মাযহাবী ভাইদের দলীলটি গ্রহণ করা গেল না।

৩. ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত হাদীসের পক্ষে একাধিক সাহাবী রা. এর আমল রয়েছে। যেমন: হযরত উমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আনাস প্রমুখ সাহাবা রা.। অথচ আবু হুরাইরা রা. এর হাদীসের উপর একমাত্র ইবনে উমর রা. ছাড়া অন্য কোনো সাহাবীর আমল পাওয়া যায় না। ইবনে উমর রা. থেকে আবার ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. এর হাদীস মোতাবেক আমলও বর্ণিত আছে। তাই আবু হুরাইরা রা. এর হাদীসের উপর ইবনে উমর রা. এর আমল থাকা না থাকার মতই।

৪. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে মুসল্লিকে বিভিন্ন প্রাণীর সাদৃশ্যতা অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন। যেমন: শিয়ালের মত এদিক-সেদিক তাকাতে, হিংস্র প্রাণীর মত হাত বিছিয়ে রাখতে, কাকের মত ঠোকর দিতে, কুকুরের মত বসতে, অবাধ্য ঘোড়ার লেজ নাড়ার মত বারবার হাত ওঠাতে এবং উটের মত সিজদায় যেতে নিষেধ করেছেন। অথচ হযরত আবু হুরাইরা রা. সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করলে সিজদায় যাওয়ার সময় উটের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করা থেকে বাঁচা যায় না। তাই সিজদায় যাওয়ার সময় উটের সাদৃশ্যতা অবলম্বন থেকে বাঁচার জন্য ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। (বিস্তারিত দেখুন ‘যাদুল আমাদ: ১/২১৫, আল মুগনী ইবনে কুদামাহ: ৩০৩)

এসব কারণ বিবেচনায় উম্মতের অধিকাংশ ফকীহ এবং মুহাদ্দিস হযরত আবু হুরাইরা রা. এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে আমলযোগ্য মনে করতে পারেননি। বরং ১৪শ বছর ধরে তারা হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর এর হাদীস অনুযায়ী আমল করে আসছেন। শান্তিপূর্ণ মুসলিম সমাজে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টির লক্ষ্যেই লা-মাযহাবী ভাইয়েরা হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত অগ্রহণযোগ্য হাদীসটিকে সম্বল বানিয়েছে, আর আবু হুরাইরা রা. থেকে এ ব্যাপারে মা‘মূল বিহী যে হাদীসটি ছিল (আমাদের তিন নং দলীল) সেটি তারা প্রত্যাখ্যান করেছি। সেটা গ্রহণ করার দ্বারা তো সমাজে ফেতনা ফাসাদ ছড়ানো যাবে না! আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হেদায়াত দান করুন। আমাদেরকে তাদের ফেতনা থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

বিতিরের নামায এক সালামে তিন রাকআত বিতিরের নামায ওয়াজিব:

প্রত্যেক মুসলমান প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিস্কসম্পন্ন পুরুষ ও মহিলার উপর ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার ফরয নামায আদায় করা যেমন ফরযে আইন, তেমনি বিতিরের নামায আদায় করা ওয়াজিব।

বিতিরের নামায আদায় করার সময় হল, ইশার ফরয ও সুন্নাহ আদায়ের পর থেকে সুবহে সাদেক উদিত হওয়া পর্যন্ত।

নিম্নে এ বিষয়ের কিছু হাদীস উল্লেখ করা হল:-

عن خارجة بن حذافة: أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر .

(১) অর্থ: হযরত খারিজা ইবনে হুযাফা রা. বলেন: একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে উপস্থিত হলেন এবং বললেন: আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এমন এক নামায দান করেছেন, যা তোমাদের জন্য লাল উটনীসমূহ থেকে উত্তম, নামাযটি হল বিতিরের নামায। তিনি বিতিরের নামাযকে তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে। (সুনানে তিরমিযী-হাদীস নং ৪৫২, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা [শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামা দা. বা. এর হাশিয়া সহ হা. নং ৬৯২৮, মুসতাদরাতে হাকেম-হা. নং ১১৪৮, উমদাতুল কারী-হা. ৯৯৮)

ফায়দা: যেহেতু ফরয নামাযের রাকআত সংখ্যা নির্ধারিত, এর চেয়ে কম-বেশী করা যায় না, তাই এই হাদীসে ১৭ রাকআত ফরয নামাযের উপর ৩ রাকআত বিতিরের নামাযকে দান বলা হয়েছে।

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا.

(২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা রহ. তার পিতা বুরাইদা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, বিতিরের নামায অপরিহার্য, সুতরাং যে বিতিরের নামায পড়ে না, সে আমার দলভুক্ত নয়। বিতিরের নামায অপরিহার্য, যে বিতিরের নামায পড়ে না, সে আমার দলভুক্ত নয়। বিতিরের নামায অপরিহার্য, যে বিতিরের নামায পড়ে না, সে আমার দলভুক্ত নয়। (সুনানে আবু দাউদ- হা.নং ১৪১৯, মুসতাদরাতে হাকীম-হা.নং ১১৪৬, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা- হা.নং ৬৮৬৯)

(৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: প্রত্যেক মুসলমানের উপর বিতির জরুরী, ওয়াজিব।

কিন্তু কেউ সময়মতো বিতিরের নামায আদায় করতে না পারলে পরবর্তীতে ঐ বিতির ক্বাযা করে নিবে। বিতির নামায সুন্নাহ হলে ক্বাযা করার প্রয়োজন হতো না।

উপরিউক্ত হাদীস গুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিতিরের নামায আদায় করা ওয়াজিব, সুতরাং কেউ সময়মতো বিতিরের আদায় করতে না পারলে পরবর্তীতে এই বিতির ক্বাযা করে নিবে, বিতিরের নামায সুন্নাহ হলে ক্বাযা করার প্রয়োজন হত না।

নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো:

عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره .

১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি বিতির না পরে ঘুমিয়ে পড়ল কিংবা বিতির পড়তে ভুলে গেল, সে যেন স্মরণ হওয়ার পর বিতিরের নামায আদায় করে নেয়। (সুনানে আবু দাউদ- হা.নং ১৪৩১, মুসতাদরাকে হাকীম-হা.নং ১১২৮.)

عن أبي مريم قال: جاء رجل إلى علي قال: إن نمت ونسيت الوتر حتى طلعت الشمس! فقال: إذا استيقظت وذكرت فصل .

২. অর্থ: হযরত আবু মারইয়াম রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক লোক আলী রা. এর নিকট এসে বলল: আমি তো ঘুমানোর কারণে বিতিরের নামায পড়তে ভুলে গিয়েছি, এমনকি সূর্য উদিত হয়ে গেছে, তখন হযরত আলী রা. বললেন: যখন তুমি জাগ্রত হয়েছো তখন তুমি বিতিরের নামায পড়ে নাও। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-হা. নং ৬৮৬৯)

عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس و عبادة بن صامت و القاسم بن محمد و عبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر .

৩. অর্থ: ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণিত তাঁর কাছে পৌঁছেছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., উবাদা ইবনে সামিত রা., কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ রহ., আব্দুল্লাহ ইবনে আমির ইবনে রাবীআ রহ., ফজরের পর বিতির নামায পড়েছেন, অর্থাৎ সময়মতো বিতির পড়তে না পারায় ফজরের পর ক্বাযা হিসেবে পড়েছেন। (মুআত্তা মালিক-হা. ১৪৮)

বিতির নামায তিন রাকআত:

নামাযের ব্যাপারে শরীয়তের মূলনীতি এই যে; ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদা ও নফল সবধরনের নামাযের সর্বনিম্ন রাকআত হল: দুই রাকআত। তাই দুই রাকআতের কমে এক রাকআত কোনো নামাযই নেই।

عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: রাত ও দিনের নামায দুই দুই রাকআত। (সুনানে তিরমিযী-হা. নং ৫৯৬, মুআত্তা মালেক- হা. নং ১৩৯, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-হা. নং ৬৬৮৬-৬৬৮৮)

হ্যাঁ, দুই রাকআতের বেশি তিন বা চার রাকআত ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদা, ও নফল নামায আছে। আর বিতির শব্দের অর্থ যেহেতু বেজোড়, আর দুই রাকআতের কমে এক রাকআত কোনো নামায নেই; সুতরাং, বিতির নামায তিন রাকআত হওয়া নির্ধারিত হয়ে গেল।

নিম্নে বিতির নামায তিন রাকআত হওয়া সম্পর্কিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হলো:

عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم: صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت.

১. অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: রাতের নামায দুই রাকআত-দুই রাকআত। সবশেষে যখন তুমি (তাশাহুদ পড়ে) সালাম ফিরানোর ইচ্ছা করবে, তখন সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আরও এক রাকআত মিলিয়ে নিবে, যা তোমার আদায়কৃত দুই রাকআতকে বিতির বা বেজোড় (তথা তিন রাকআত) বানিয়ে দিবে। (বুখারী- হা. ৯৯৩, সহীহ মুসলিম হা. নং ৭৪৯, সুনানে নাসাঈ-হা. নং ১৬৬৬-১৬৭৪, সুনানে আবু দাউদ-হা. নং ১৩২৬, সুনানে তিরমিযী-হা. নং ৪৩৭, শরহে মাআনিল আসার-১/১৯৭)

أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأل عائشة رضى كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن، ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن، ثم يصلى ثلاثا.....

২. অর্থ: হযরত আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা রা. কে জিজ্ঞাসা করলেন, রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায কেমন হতো? আয়িশা রা. বললেন: (শুধু রমযান মাস কেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে এবং অন্যান্য মাসেও এগারো রাকআতের বেশি পড়তেন না। তিনি প্রথমে চার রাকআত তাহাজ্জুদ পড়তেন, এর দৈর্ঘ্য আর সৌন্দর্য সম্পর্কে কী বলব? এরপর আরও চার রাকআত পড়তেন, এর দৈর্ঘ্য আর সৌন্দর্য বর্ণনাতীত! এরপর তিন রাকআত বিতির নামায পড়তেন। (বুখারী- হা. ১১৪৭, মুসলিম-হা. ৭৩৮, সুনানে নাসাঈ-হা. ১৬৯৭, সুনানে আবুদাউদ-হা. ১৩৩৫, মুসনাদে আহমাদ-হা. ২৪০৭৩)

عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثمان ركعات ويوتر بثلاث و يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر .

৩. অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে আট রাকাতাত তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং তিন রাকাতাত বিতির পড়তেন, আর ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকাতাত সুন্নাত পড়তেন। (সুনানে নাসাঈ-হা.নং ১৭০৭)

عن عامر الشعبي قال: سألت ابن عباس وابن عمر: كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ فقالا: ثلاث عشرة ركعة: ثمان و يوتر بثلاث و ركعتين بعد الفجر.

৪. অর্থ: হযরত আমের ইবনে শুরাহবীল শা'বী রহ. বলেন: আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাতের নামায সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে জিজ্ঞাসা করেছি, তারা বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেরো রাকাতাত নামায পড়তেন, আট রাকাতাত তাহাজ্জুদ ও তিন রাকাতাত বিতির এবং সুবহে সাদিক হওয়ার পর দুই রাকাতাত সুন্নাত। (তাহাবী-১/১৯৭)

৫. বিতির নামাযের তিন রাকাতাতে সূরা ফাতিহার পর নির্দিষ্ট তিন সূরা মিলিয়ে পড়ার হাদীস যে সকল সাহাবায়ে কেলাম রা. বর্ণনা করেছেন, তাদের নাম হাওয়ালাসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:-

১/ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.। (সুনানে তিরমিযী-হা. নং৪৬৩, মুসনাদে আহমাদ-৬/২২৭, মুসতাদরাকে হাকেম-হা.নং১১৪৪)

২/ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.। (সুনানে দারেমী-১৫৯৭, সুনানে নাসাঈ-হা.১৭০২, সুনানে তিরমিযী-হা. ৪৬২, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-৬৯৪৯-৫১)

৩/ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবযা রা.। (সুনানে নাসাঈ-হা.নং১৭৩১, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-হা.নং৬৯৪৩-৪৪, মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাক-২/৩৩, শরহু মাআনিল আছার তাহাবী-১/১৪৩)

৪/ হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রা.। (মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাক -৩/৩৪, শরহু মাআনিল আছার তাহাবী-১/২০৩)

৫/ হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.। (নাসাঈ-হা.নং১৭২৯-৩০, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-হা.নং৬৯৬০, সুনানে আবু দাউদ-হা.নং ১৪২৩)

৬/ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা.। (শরহু মা'আনিল আছার তাহাবী-১/১৪২, মাজমাউয্ যাওয়াইদ- ৪/২৪১)

৭/ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.। (মাজমাউয্ যাওয়াইদ-৪/২৪১, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-হা.নং ৬৯৪৭)

৮/ হযরত নু'মান ইবনে বাশীর রা.। (মাজমাউয্ যাওয়াইদ-৪/২৪১)

৯/ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.। (মাজমাউয্ যাওয়াইদ-৪/২৪১)

১০/ হযরত আবু হুরাইরা রা.। (মাজমাউয্ যাওয়াইদ-৪/২৪১)

১১/ হযরত আবু খাইছামাহ রা. তার পিতা হযরত মুআবিয়া ইবনে খাদিজ রা. থেকে বর্ণিত।

১২/ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা.। (মাজমাউয্ যাওয়াইদ-৪/২৪১)

এ সকল হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, বিতির নামায তিন রাকাত, এক রাকাত নয়।

عن عبد الله بن أبي قيس قال: قلت لعائشة رضي: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث و ست وثلاث وثمان وثلاث وعشرو ثلاث ولم يكن يوتر بأقل من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة .

৬. অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী কাইস রহ. বলেন: আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতির কত রাকাত পড়তেন? তিনি বললেন: চার এবং তিন, ছয় এবং তিন, আট এবং তিন, দশ এবং তিন। তিনি বিতির (তাহাজ্জুদসহ) সাত রাকাতের কম এবং তেরো রাকাতের অধিক পড়তেন না। (সুনানে আবু দাউদ-হা.১৩৬২, তাহাবী-১/১৩৯, মুসনাদে আহমাদ-হা.২৫১৫৯)

এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামায কখনও চার রাকাত, কখনও ছয় রাকাত, কখনও আট রাকাত, কখনও দশ রাকাত পড়তেন।

কিন্তু মূল বিতিরের নামায সর্বদা তিন রাকাতই পড়তেন।

عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث .

৭. অর্থ: হযরত আবু সালামা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বিতিরের নামায পড়তেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-হা.নং ৬৯১৩)

عن عمر بن الخطاب: أنه قال: ما أحب أني تركت الوتر بثلاث وإن لي حمرا ناعم .

৮. অর্থ: হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন: যদি আমাকে তিন রাকাত বিতির পরিত্যাগের জন্য লাল উটনীসমূহও প্রদান করা হয়, তবুও আমি তিন রাকাত বিতিরের নামায পরিত্যাগ করা পছন্দ করব না। (মুআত্তায়ে মুহাম্মাদ-হা.নং ২৬০, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-হা.নং ৬৯৩৩)

এ সকল হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, বিতিরের নামায তিন রাকআত, এক রাকআত নয়।

তিন রাকআত বিতিরের নামায দুই বৈঠকে ও এক সালামে পড়া জরুরী

حدثنا سعيد.....عن سعد بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر .

১. অর্থ: হযরত সা'দ ইবনে হিশাম রহ. বলেন: হযরত আয়িশা রা. তাকে বলেছেন যে, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতিরের দুই রাকআতের পর সালাম ফিরাতেন না। (সুনানে নাসাঈ-হা. ১৬৯৮ মুআত্তায়ে মুহাম্মাদ হা.নং ২৬৬, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-হা. নং ৬৯১২)

عن حدثنا سعيد بن أبي عروبة.....عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر .

২. উক্ত সনদে হাদীসটি এভাবেও বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতিরের নামাযের প্রথম দুই রাকআতের পর সালাম ফিরাতেন না। (মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাইন-হা.১১৩৯)

عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب علي و أصحاب عبد الله لا يسلمون في ركعتي الوتر.

৩. অর্থ: হযরত আবু ইসহাক রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আলী রা. এর শাগরিদগণ ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর শাগরিদগণ বিতিরের নামাযের দুই রাকআতের পর সালাম ফেরাতেন না। সালাম ফিরাতেন সবশেষে তৃতীয় রাকআতে। যদি দ্বিতীয় রাকআতের শেষে বৈঠক করার নিয়ম না থাকত, তাহলে সালাম ফিরানোর বা না ফিরানোর কোনো প্রসঙ্গই আসতো না। কেননা, সালামতো বসেই ফিরানো হয়ে থাকে।

حدثنا أبان.....عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، لا يسلم إلا في آخرهن وهذا وتر امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضـ و عنه أخذه أهل المدينة .

৪. অর্থ: হযরত সা'দ ইবনে হিশাম রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রা. বলেন: রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতির নামায তিন রাকআত পড়তেন এবং শুধু শেষ রাকআতে সালাম ফিরাতেন। আর এটিই আমীরুল মুমিনীন উমর রা. এর বিতিরের নামাযের পদ্ধতি এবং তাঁরই সূত্রে মদীনাবাসী এই নিয়ম গ্রহণ করেছেন। (মুসতাদরাকে হাকীম-হা.নং ১১৪০)

عن أنس أنه أوتر بثلاث، لم يسلم إلا في آخرهن .

৫. অর্থ: হযরত আনাস রা. বর্ণিত, তিনি তিন রাকআত বিতিরের নামায পড়েছেন এবং শুধু শেষ রাকআতে সালাম ফিরিয়েছেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-হা. নং ৬৯১০)

عن أبي الزناد قال: أثبت عمر بن عبدالعزيز الوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلاثا لا يسلم إلا في آخرهن.

৬. অর্থ: হযরত আবু য়িনাদ রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. মদীনায ফুকাহায়ে কেরামের সিদ্ধান্তানুযায়ী বিতিরের নামায তিন রাকআত নির্ধারণ করেছেন এভাবে যে, এই তিন রাকআতের শুধু শেষ রাকআতে সালাম ফিরাতে হবে। (শরহ মা'আনিল আছার তাহাবী-১/২০৭)

এই তিনটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আনাস রা. ও উমর ইবনে খাত্তাব রা. তারই সূত্রে মদীনাবাসীগণ সর্বদা তিন রাকআত বিতিরের নামাযের শুধু শেষ রাকআতেই সালাম ফেরাতেন এবং খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. সাতজন বিজ্ঞ ফকীহের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মদীনায উপরোক্ত পদ্ধতিতে বিতিরের নামায আদায় করার ফরমান জারী করেছেন।

عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء دخل المنزل ثم صلى ركعتين، ثم صلى بعدهما ركعتين أطول منهما، ثم أوتر بثلاث لا يفصل فيهن

৭. হযরত সা'দ ইবনে হিশাম রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রা. বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার ফরয নামায আদায় করে ঘরে আসতেন অতঃপর দুই রাকআত নামায পড়তেন। অতঃপর আরও দুই রাকআত পড়তেন, যা পূর্বের দুই রাকআত নামাযের চেয়ে দীর্ঘ হত। অতঃপর তিন রাকআত বিতিরের নামায পড়তেন, যার মাঝখানে সালাম দ্বারা আলাদা করতেন না। (মুসনাদে আহমাদ-হা.নং২৫২২৩)

عن عمر بن الخطاب رضي أنه أوتر بثلاث ركعات لم يفصل بينهما بسلام .

৮. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তিন রাকআত বিতিরের নামায পড়েছেন এবং এই তিন রাকআতের মাঝে কোনো সালাম দ্বারা ব্যবধান করেননি। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা- হা. নং ৬৯০১)

عن بن عمر رضي قال: صلاة المغرب وتر صلاة النهار.

৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: মাগরিবের নামায দিনের বিতির (বেজোড়)। (মুআত্তায়ে মুহাম্মাদ হা. ২৪৯, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-হা ৬৭৭৮)

উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিতিরের নামায তিন রাকআত দুই বৈঠকে ও এক সালামে পড়তে হবে। এটিই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এর আমল এবং সাহাবায়ে কেরাম রা. এর আমল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এক রাকাতাত বিতির পড়া বা তিন রাকাতাত বিতির দুই সালামে পড়া সহীহভাবে প্রমাণিত নেই। হ্যাঁ, ২/১জন সাহাবী থেকে এরূপ বিতির পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অকাটা আমলের মুকাবিলায় ২/১ জন সাহাবীর আমল গ্রহণযোগ্য নয়।

এ কারণেই হাফেয ইবনুস সালাহ রহ. বলেছেন: বিতিরের বর্ণনা অধিক হওয়া সত্ত্বেও আমরা কোনো বর্ণনায় একথার প্রমাণ পাইনি যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এক রাকাতাত পড়ে বিতির আদায় করেছেন। (ফাতহুল বারী- ২/ ১৫)

শরয়ী প্রমাণপঞ্জির আলোকে তারাবীহের রাকাতাত সংখ্যা

তারাবীহের রাকাতাত সংখ্যা কোন যুগেই মতভেদ বা উচ্চবাচ্যের কোন বিষয় ছিল না।

ইসলামের স্বর্ণযুগ তথা সাহাবাযুগ থেকে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি যুগেই হারামাইন শরীফাইন থেকে শুরু করে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি মসজিদে সর্বসম্মতভাবে ২০ রাকাতাত করেই আদায় হয়ে আসছিল।

এই উপমহাদেশের মাটিতে কুচক্রী ইংরেজ সম্প্রদায় জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসার পর থেকেই দৃশ্যপট বদলাতে শুরু করে, তারা মুসলমানদের গৌরবময় ঐক্য ও সম্প্রীতিকে নস্যাৎ করে দিয়ে নিজেদের খুঁটি পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে বেশ কিছু নীল-নকশা আঁটে, তারই অন্যতম একটি হচ্ছে ইসলামের সোনালীযুগ থেকে সর্বসম্মত ও অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার বিপরীতে পরিত্যক্ত, ভ্রান্তি ও বিচ্যুতিপূর্ণ, মুনকার মতকে উস্কে দিয়ে সরলমনা মুসলিমদের মাঝে স্থায়ী বিভেদ ও অনৈক্যের দেয়াল তুলে দেওয়া।

তাদের এই হীন চক্রান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা তাদের পদলেহনকারী কিছু লোকদের বাগিয়ে নিতে সক্ষম হয়, ফলশ্রুতিতে এই এজেডা নিয়ে আলেম নামধারী কতিপয় অপরিণামদর্শী ও বিপথগামী ব্যক্তি আদাজল খেয়ে মাঠে নামে। তারাবীহের রাকাতাত সংখ্যা নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা তাদের সেই ধারাবাহিকতারই একটি অংশ, তাই সর্বপ্রথম এই উপমহাদেশে এক লা-মাযহাবী আলেমের কণ্ঠে তারাবীহর নামায আট রাকাতাত হওয়ার দাবি উঠল, যে ব্যক্তি ইংরেজদের থেকে নিজ সম্প্রদায়ের নাম আহলে হাদীস মনজুর করিয়ে নিয়েছিল।

(কিন্তু আল্লাহর অশেষ কৃপা যে, তাদের মতাদর্শেরই আরেক আলেম মাওলানা গোলাম রাসূল সাহেব ১২৯০ হি.তে তাদের এই অলীক দাবিকে খণ্ডন করে “রেসালায়ে তারাবীহ” নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।)

২০ রাকাতাত এর দলীলসমূহ নবী যুগে তারাবীহ

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত-

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فضلى بصلوته ناس، ثم صلى من القابلة، فكثرت الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، قال: وذلك في رمضان. (مسلم: الترغيب في صلاة التراويح ٥/٢٥٩)

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাতে মসজিদে তারাবীহ পড়লেন। সাহাবীগণও তাঁর সঙ্গে নামাযে शामिल হলেন। দ্বিতীয় রাতে মুকতাদী সংখ্যা আরও বেড়ে গেল, অতপর তৃতীয় বা চতুর্থ রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারাবীহের জন্য বের হলেন না, প্রত্যুষে সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন: আমি তোমাদের আগ্রহ ও উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি, কিন্তু এ নামায তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় আমি তোমাদের কাছে আসিনি।’ (সহীহ মুসলিম: ১/২৫৯)

২. হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত-

عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى في رمضان عشرين ركعة والوتر. (المصنف لابن أبي شيبة ٢/٢٢٢)

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে ২০ রাকআত তারাবীহ ও বিতর পড়তেন।’ (আল মুসান্নাফ: ২/২৮৮)

আরও দ্রষ্টব্য: আল- মুনতখাব মিন মুসনাদি আব্দ ইবনে হুমাইদ: পৃ.২১৮, হাদীস- ৬৫৩; আস-সুনানুল কুবরা[বাইহাকী]: ২/৪৯৬; আল-মু'জামুল কাবীর (তবারানী) ১১/৩১১, হাদীস-১২১০২; আল মুজামুল আওসাত[তবারানী]: ১/৪৪৪, হাদীস-৮০২; আত তামহীদ [ইবনে আব্দুল বার:] ৮/১১৫; আল ইসতিযকার: ৫/১৫৬)

পর্যালোচনাঃ

হাদীসটির সনদে ইবরাহীম ইবনে উসমান নামক একজন যঈফ রাবী থাকায় একদল মুহাদ্দিস হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। তবে তিনি বেশী যঈফ তথা মাতরুক বা পরিত্যাজ্য নন।

দ্রষ্টব্য: আল কামিল ইবনে আদী: ১/৩৮৯-৩৯৩২; তাহযীবুত তাহযীব: ১/১৪৪; ইলাউস সুনান: ৭/৮২- ৮৫;

তদুপরি উসূলে হাদীসের নির্ভরযোগ্য মূলনীতি হল: যঈফ দুই প্রকার

এক. যে ‘যঈফ সনদে’ বর্ণিত রেওয়াযাতটির বক্তব্য শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক, এ ধরনের যঈফ কোন অবস্থাতেই আমলযোগ্য নয়।

দুই. তার বক্তব্যের সমর্থনে শরীয়তের অন্যান্য দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান, মুহাক্কিক মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের সিদ্ধান্ত হল: এ ধরনের রেওয়াযাতকে ‘যঈফ’ বলা হলে তা

হবে শুধু ‘সনদ’ এর বিবেচনায় এবং নিতান্তই নিয়ম রক্ষামূলক, অন্যথায় বক্তব্য ও মর্মের বিচারে এটি সহীহ।

উসূলে হাদীসের এই নীতির ব্যাপারে হাদীসশাস্ত্রের অনেক ইমামের অসংখ্য উদ্ধৃতির মধ্য হতে এখানে শুধু দু’টি উদ্ধৃতি পেশ করছি:

১. ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী রহ. উসূলে হাদীসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ ‘আন নুকাত’ এ লিখেন:

إن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح, حتى ينزل منزلة المتواتر.
(النكات على مقدمة ابن الصلاح ১/৩৯০)

‘যঈফ হাদীস যখন ব্যাপকভাবে উম্মাহর (মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের) কাছে সমাদৃত হয়, তখন সে হাদীস অনুযায়ী আমল করা হবে, এটাই বিশুদ্ধ কথা। এমনকি তখন তা হাদীসে মুতাওয়াতির (বিপুল সংখ্যক সূত্রে ধারাবাহিক বর্ণিত) হাদীসের পর্যায়ে পৌঁছে যায়।’ (আন নুকাত আলা মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ: ১/৩৯০)

২. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ‘আন নুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ’ (১/৪৯৪) এ লিখেন:

ومن جملة صفات القبول أن يتفق العلماء على العمل بمذلول الحديث, فإنه يقبل حتى يجب العمل به, وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول. (النكات على كتاب ابن الصلاح ১/৪৯৪)

‘হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার একটি নিদর্শন এই যে, ইমামগণ উক্ত হাদীসের বক্তব্যের উপর আমল করতে একমত হওয়া। এ ক্ষেত্রে হাদীসটি গ্রহণ করা হবে এবং এর উপর আমল অপরিহার্য হবে। উসূলের অনেক ইমাম এই মূলনীতি উল্লেখ করেছেন।’

এই হাদীসের ব্যাপারে আরো আলোচনা ইলাউস সুনান: ৭/৮২-৮৪; মুহাদ্দিস হযরত হাবীবুর রহমান আযমী রহ. লিখিত ‘রাকআতে তারাবীহ’: ৬৩-৬৯ এবং মাওলানা আমীন সফদর রহ. লিখিত ‘তাহকীকে মাসআলায়ে তারাবীহ’: ১/২০৫-২১৩ (মাজমুআয়ে রাসায়েল- ইত্যাদি কিতাব দ্রষ্টব্য)

অতএব হাদীসটি ‘আভিধানিক’ যঈফ হলেও উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা লা-মায়হাবী বন্ধুগণের কাছেও এটি অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত হতে আর কোন বাধা রইল না।

খেলাফতে রাশেদীনের যুগ

পূর্বোক্ত বর্ণনার দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগ ওহী অবতীর্ণ হওয়া ও শরীয়তের বিধানসমূহের বিধিবদ্ধ হওয়ার যুগ থাকায় জামাআতের সাথে নিয়মিত নামায পড়লে এ নামাযটিও উম্মতের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল, তাই তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে তারাবীহের নামায জামাআতের সাথে আদায় করেন নি, বরং প্রত্যেককে স্ব স্ব ঘরে আদায় করে নিতে বলেছিলেন।

পরবর্তীতে খুলাফয়ে রাশেদীনের যুগে (হযরত উমর রায. এর তত্ত্বাবধানে) নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিশ রাকাত তারাবীহ পড়ার আমল শুরু হয়। এর দ্বারাই বিশ রাকাত পড়া সুন্নাত বলে সাব্যস্ত হয়। কেননা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ

অর্থ: তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর। (সুনানে তিরমিযী হা. ২৬৭৬) অতএব, খুলাফায়ের রাশেদীনের সুন্নাতও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের মতই অনুসরণীয়।

২য় খলীফা হযরত উমর রা. এর খেলাফতকাল

উমর রা. কর্তৃক নিয়মতান্ত্রিকভাবে তারাবীহের জামাআতের সূচনা প্রখ্যাত তাবেয়ী আব্দুর রহমান আল কারী রহ. এর বর্ণনা:

عن عبد الرحمن القارئ خرجت مع عمر بن الخطاب رض في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلى الرجل لنفسه، ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط، فقال عمر: والله إنى لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على بى بن كعب، ...ألخ (موطأ مالك (882):

‘আমি রমযান মাসে উমর রা. এর সঙ্গে মসজিদে গিয়ে দেখলাম লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তারাবীহ পড়ছেন, কেউ একা পড়ছেন, আবার কেউ দু’ চারজন সঙ্গে নিয়ে পড়ছেন। তখন উমর রা. বললেন: ‘এদের সকলকে যদি এক ইমামের পিছনে জামাআতবদ্ধ করে দেই তাহলে মনে হচ্ছে উত্তম হয়। এরপর তাদেরকে তিনি উবাই ইবনে কা’ব রা. এর পিছনে জামাআতবদ্ধ করে দিলেন।’ (মুআত্তা মালিক:হা.৪৪২)

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. (মৃ.৪৬৩ হি.) মুআত্তা মালেকের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘আত তামহীদ’ এ বলেন:

“উমর ইবনুল খাত্তাব রা. নতুন কিছু করেন নি, তিনি তা-ই করেছেন যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন; এবং ৩/৪ দিন আমল করেও দেখিয়েছেন কিন্তু শুধু এই আশংকায় যে, নিয়মিত জামাআতের কারণে তারাবীহের নামায উম্মতের উপর ফরয হয়ে যেতে পারে, তাই তিনি স্থায়ীভাবে জামাআতের ব্যবস্থা করেন নি। উমর রা. এই বিষয়টি জানতেন, তিনি দেখলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পর এখন আর ফরয হওয়ার ভয় নেই। (কেননা ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এবং শরীয়ত নির্ধারণের বিষয়টি সম্পন্ন হয়ে গেছে।) তখন তিনি নবীজীর দিলের তামান্না মোতাবেক ১৪ হিজরীতে জামাআতের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ তাআলা এই মর্যদা তাঁর জন্যই

নির্ধারিত রেখেছিলেন। আবু বকর সিদ্দীক রা. এর মনে এই চিন্তা আসে নি। যদিও সামগ্রিকভাবে তিনিই উত্তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন।” (আত তামহীদ:৮/১০৮-১০৯)

১. হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. বলেন:

عن أبي بن كعب أن عمر بن الخطاب أمره أن يصلي بالليل في رمضان فصلى بهم عشرين ركعة (كنز العمال) ৮/২৬৪

‘উমর রা. আমাদের রমযানের রাতে লোকদেরকে ২০ রাকআত তারাবীহ পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন।’ (কানযুল উম্মাল : ৮/২৬৪)

২. সাহাবী হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ রা. এর বিবরণ:

كنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب رضى بعشرين ركعة والوتر. (السنن الكبرى للبيهقي, ১/২৬৭-২৬৮: ২/৩০৫)

‘আমরা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর যুগে ২০ রাকআত তারাবীহ এবং বিতর পড়তাম।’ (আস-সুনানুল কুবরা [বায়হাকী]: ১/২৬৭-২৬৮; মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার [বায়হাকী]: ২/৩০৫)

৩. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণিত-

عن يحيى بن سعيد عن عمر بن الخطاب أنه أمر رجلا أن يصلي بهم عشرين ركعة. (مصنف ابن أبي شيبة) ২/৩৯৩

‘উমর ইবনে খাত্তাব রা. এক ব্যক্তিকে লোকদের ২০ রাকআত পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ২/৩৯৩)

৪. হযরত ইয়াযীদ ইবনে রুমান থেকে বর্ণিত-

عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. (مؤطا مالك: ৪০)

‘উমর ইবনে খাত্তাব রা. এর যুগে মানুষ (সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন) রমযান মাসে সর্বমোট ২৩ রাকআত আদায় করতেন’ (২০ রাকআত তারাবীহ এবং ৩ রাকআত বিতর ছিল। (মুআত্তা মালিক: পৃ-৪০, আরও দ্রষ্টব্য:- মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ২/২৮৫, মুআত্তা মালিক: পৃ.৪০, কিয়ামুল লাইল-পৃ. ১৫৭; মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাক: ৪/২৬০১)

পর্যালোচনাঃ

এই বর্ণনাগুলোর মূল বক্তব্য মুতাওয়াতিহ হওয়ায় অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রকারের দ্বিধা-দন্দেব অবকাশ নেই, তথাপি লা-মাহাবী বন্ধুদের অভিযোগ হলো এই বর্ণনাগুলো মুরসাল, আর মুরসাল হলো যঈফ।

অথচ এটা প্রমাণিত যে, তাবেয়ী ইমামগণের ‘মুরসাল’ বর্ণনা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। দলীলের আলোকে পূর্বসূরী ইমামগণ এ বিষয়ে একমত ছিলেন। উপরন্তু যদি একই বক্তব্যের উপর একাধিক মুরসাল রেওয়ায়াত থাকে কিংবা মুরসাল বর্ণনার সমর্থনে উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা বিদ্যমান থাকে তাহলে যারা মুরসালকে যঈফ বলেছেন তারাও এটাকে সহীহ বা দলীলযোগ্য মনে করেন। এ প্রসঙ্গে অসংখ্য উদ্ধৃতির মধ্য থেকে এখানে শুধু আমাদের লা-মায়হাবী ভাইদের ‘আস্হাভাজন’ ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্যটিই উদ্ধৃত করছি:

المرسل الذي له ما يوافقه او الذي عمل به السلف حجة باتفاق الفقهاء.

(إقامة الدليل على بطلان التحليل, الفتاوى الكبرى 8/599):

‘যে মুরসালের সমর্থনে অন্য কোন বর্ণনা পাওয়া যায় কিংবা পূর্বসূরীগণ যার উপর আমল করেছেন তা ফকীহগণের সর্বসম্মতিক্রমে দলীল হিসেবে গ্রহণীয়।’ (ইকামাতুদ দলীল আলা বুতলানিত তাহলীল আল ফাতাওয়াল কুবরা: 8/599, আরো দ্রষ্টব্য: মাজমুআতুল ফাতাওয়া: 23/291; মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়া: 8/519)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এ প্রসঙ্গেই বলেছেন:

إنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث. (مجموعة الفتاوى 513-512/23):

‘এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, উবাই ইবনে কা’ব রা. রমযানের তারাবীহতে মুসল্লীদের নিয়ে ২০ রাকআত পড়তেন এবং তিন রাকআত বিতর পড়তেন।’ (মাজমুআতুল ফাতাওয়া: 23/512-513)

২০ রাকআত তারাবীহ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন:

ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين .

‘খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ এবং মুসলিম জাতির সম্মিলিত কর্ম দ্বারা এটি প্রমাণিত।’ (প্রাগুক্ত)

৩য় খলীফা হযরত উসমান রা. এর খেলাফতকাল

হযরত উসমান রা. এর যুগেও তারাবীহ ২০ রাকআত পড়া হত।

হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ রা. বলেন:

كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة, وكانوا يقرؤون بالمئين, وكانوا يتكؤون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام.

(بيهقي: عدد ركعات القيام في رمضان 8/2 رجاله ثقات: آثار السنن)

‘উমর রা. এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম তারাবীহের নামায় ২০ রাকআত পড়তেন এবং শতাধিক আয়াতবিশিষ্ট সূরা পড়তেন। উসমান রা. এর যুগে দীর্ঘ সময় দণ্ডায়মান থাকার কারণে তাদের অনেকে লাঠিতে ভর দিতেন।’ (সুনানে বায়হাকী:২/৪৯৬)

৪র্থ খলীফা হযরত আলী রা. এর খেলাফতকাল:

চতুর্থ খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী রা.ও স্বীয় খিলাফতকালে তারাবীহের নামায় ২০ রাকআত পড়ার আদেশ দিয়েছেন।

১. আবু আব্দুর রহমান আস সুলামী বলেন-

عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عليّ قال: دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلا يصلي بالناس عشرين ركعة, قال: وكان عليّ يوتر بهم. (بيهقي ২/৪৯৬: عدد ركعات القيام في رمضان)

‘আলী রা. রমযান মাসে কারীদেরকে ডাকলেন এবং আদেশ দিলেন: তারা যেন লোকদের নিয়ে ২০ রাকআত তারাবীহ পড়েন, আর বিতর পড়াতেন স্বয়ং আলী রা. (সুনানে বায়হাকী:২/৪৯৬)

২. আবুল হাসনা রহ. থেকে বর্ণিত-

عن أبي الحسناء أن علياً أمر رجلاً يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة. (مصنف ابن أبي شيبة ২: ৩৯৩)

‘হযরত আলী রা. এক ব্যক্তিকে লোকদের নিয়ে ২০ রাকআত তারাবীহ পড়ানোর নির্দেশ দিলেন।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা:২/৩৯৩)

৩. ইমাম হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত-

حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه أنه أمر الذي يصلي بالناس صلاة القيام في شهر رمضان أن يصلي بهم عشرين ركعة يسلم في كل ركعتين و يراوح ما بين كل أربع ركعات فيرجع ذوالحاجة ويتوضأ الرجل وان يوتر بهم من آخر الليل حين الانصراف. (مسند الإمام زيد ১৩৯)

‘হযরত আলী রা. যে ইমামকে রমযানে তারাবীহ পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন তাকে বললেন: সে যেন লোকদেরকে ২০ রাকআত তারাবীহের নামায় পড়ায়, প্রতি দুই রাকআত অন্তর সালাম ফিরায়ে, এবং প্রতি চার রাকআতে বিরতি দেয়, যাতে কারও প্রয়োজন থাকলে তা সেরে উঠে নেয়, এবং সবশেষে প্রত্যাবর্তনকালে বিতর পড়িয়ে দেয়।’ (মুসনাদে ইমাম যায়দ রহ.: পৃ-১৩৯)

সাহাবায়ে কেরামের তা‘আমুল ও ইজমা (তথা সামগ্রিক কর্মপদ্ধতি)

১. আ‘মাশ রহ. বলেন:

عن أعمش قال: كان (ابن مسعود رضـ) يصلي عشرين ركعة , ويوتر بثلاث. (مروزي قيام الليل:ص-١٥٩)

‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ২০ রাকআত তারাবীহ এবং তিন রাকআত বিতর পড়তেন।’ (কিয়ামুল লাইল: পৃ-১৫৭)

২. মোল্লা আলী আল-ক্বারী রহ. বলেন:

أجمع الصحابة على أن التراويح عشرون ركعة. (مرقات: ٣/١٩٨)

‘সাহাবায়ে কেরাম রা. তারাবীহের নামায ২০ রাকআত হওয়ার উপর ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন।’ (মিরকাত: ৩/১৯৮)

৩. ফিকহে হানাফীর নির্ভরযোগ্য কিতাব ‘আল-ইখতিয়ার লি তা’লীলিল মুখতার’ এ হযরত ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বর্ণনা করেন:

روى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة رحمه الله عن التراويح وما فعله عمر رضـ فقال: التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعاً ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على أبي بن كعب فصلاها جماعة والصحابة متوافرون. منهم عثمان, وعلى وابن مسعود والعباس وابنه وطلحة والزبير ومعاذ وأبي وغيرهم من المهاجرين والأنصار رضى الله عنهم أجمعين ومارد عليه واحد منهم بل ساعده ووافقوه وأمروا بذلك. (الاختيار لتعليل المختار: للأمام

أبي الفضل مجد الدين الموصلي ١/٩٠)

‘আমি ইমাম আবু হানীফা রহ.কে তারাবীহ এবং এ ব্যাপারে উমর রা. এর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন করি, তিনি এর উত্তরে বলেছেন: তারাবীহ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং উমর রা. তা নিজের পক্ষ থেকে অনুমান করে নির্ধারণ করেননি, তিনি এ ব্যাপারে নতুন কিছু আবিষ্কারও করেননি, তিনি দলীলের ভিত্তিতে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনার ভিত্তিতেই এই আদেশ দান করেছেন, তা ছাড়া যখন উমর রা. এই নিয়ম চালু করেন এবং উবাই ইবনে কা’ব রা. এর ইমামতিতে সকল মানুষকে একত্র করে দেন। যদ্বরূন সবাই এই নামাযটি জামাআতের সাথে আদায় করতে থাকেন, তখন সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। যাদের মধ্যে উসমান, আলী, ইবনে মাসউদ, আব্বাস, ইবনে আব্বাস, তালহা, যুযায়ের, মুআজ ও উবাই রা. প্রমুখ বড় বড় মুহাজির ও আনসার সাহাবী বিদ্যমান ছিলেন। তাদের কেউই এ বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করেননি; বরং সবাই তাঁকে সমর্থন যুগিয়েছেন এবং তাঁর সাথে একমত হয়েছেন এবং অন্যদেরকেও এই আদেশ করেছেন।’ (আল ইখতিয়ার লি তা’লীলিল মুখতার [ইমাম আবুল ফযল মাজদুদ্দীন আল মাওসিলী]: ১৭০)

৪. ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. ‘আল ইসতিযকার’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة. (الاستذكار ৫/১৫৭)

‘এটিই উবাই ইবনে কা’ব রা. থেকে বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত এবং এতে সাহাবীগণের কোন ভিন্নমত নেই।’ (আল ইসতিযকার: ৫/১৫৭)

৫. ইমাম ইবনে কুদামা মাকদেসী রহ. বলেন-

ما فعله عمر وأجمع عليه الصحابة في عصره أولى بالاتباع. (المغنى ২/৬০৪)

‘উমর রা. যা করেছেন এবং তাঁর খেলাফতকালে অন্যান্য সাহাবীগণ যে ব্যাপারে একমত হয়েছেন, তাই অনুসরণের অধিক উপযুক্ত।’ (আল মুগনী: ২/৬০৪, আরও দ্রষ্টব্য:- কিয়ামুল লাইল: পৃ. ৯১ ও ১৫৮, কিতাবুল আছার {ইমাম আবু ইউসুফ রহ.} পৃ. ৪১; বায়হাকী: ২/৪৬৬; ইবনে আবী শাইবা: ২/৩৯৩; ফাতাওয়া কাযীখান: পৃ. ১১০; তাহযীবুল কামাল: ১৩/৫৯)

আইম্মায়ে সালাফের ইজমা

১. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ভাষায়:

إنه قد ثبت فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر. (مجموعة الفتاوى ১১৩-১১২/২৩)

‘এটা প্রমাণিত যে, উবাই ইবনে কা’ব রা. রমযানের তারাবীহে লোকদের নিয়ে ২০ রাকআত পড়তেন এবং তিন রাকআত বিতর পড়তেন, তাই বহু আলেমের সিদ্ধান্ত, এটিই সুন্নাত। কেননা, উবাই ইবনে কা’ব রা. মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের উপস্থিতিতেই ২০ রাকআত পড়িয়েছেন এবং কেউ তাতে আপত্তি করেননি।’ (মাজমুআতুল ফাতাওয়া: ২৩/১১২-১১৩)

৩. ইমাম যাবীদী রহ. বলেন:

وبالإجماع الذى وقع فى زمن عمر رضـ أخذ ابو حنيفة والنووى والشافعى والجمهور واختاره ابن عبد البر. (إتحاف سادة المتقين ৩/৪২২)

‘উমর রা. এর যুগে প্রতিষ্ঠিত ঐক্যমতকেই অবলম্বন করেছেন ইমাম আবু হানীফা, নববী, শাফেঈ এবং সকল ইমামগণ। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন: ৩/৪২২)

৩. ইমাম আবু বকর কাসানী রহ. বলেন-

والصحيح قول عامة العلماء لما روى أن عمر رضـ جمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان على أبي بن كعب، فصلى بهم فى كل ليلة عشرين ركعة ولم ينكر عليه احد، فيكون إجماعا منهم على ذلك. (بدائع الصنائع ১/৬৪৪)

‘অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের বক্তব্যই সঠিক, কেননা হযরত উমর রা. রমযান মাসে সাহাবায়ে কেরামকে উবাই ইবনে কা’ব রা. এর ইমামতিতে একত্র করেন এবং

উবাই ইবনে কা'ব রা. তাদেরকে নিয়ে প্রতি রাতে ২০ রাকআতই পড়তেন। কোন সাহাবী এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেননি। সুতরাং এটা তাদের ইজমাকে প্রমাণ করে।' (বাদায়েউস সানায়ে:১/৬৪৪, আরও দ্রষ্টব্য:- বিদায়াতুল মুজতাহিদ:১/১৫২; মুগনী:১/৮০৩: আওজায়ুল মাসালিক: পৃ-৩৯০; আত তা'লীকুল মুমাজ্জাদ:পৃ.-৫৩; শরহে নুফায়াহ: পৃ.-১০৪; আউনুল বারী:২/৩০৭; আল আযকার:৪/৪০১; ফাতহুল কাদীর:১/৪০৭; আল বাহরুর রাইক্ব:২/৬৬; বাদাইয়ুস সানায়ে':১/২৮৮; শরহে মুনিয়া: পৃ.-৩৮৮; মারাকিল ফালাহ:পৃ-৮১)

(উল্লেখ্য: এটা সুস্পষ্ট যে, ইমাম মালেক রহ. এর নিকট তারাবীহের নামায় মোট ৩৬ রাকআত হলেও তিনি ২০ রাকআতের কম তথা ৮ রাকআত না হওয়ার দিক দিয়ে সমস্ত ইমামের প্রতিষ্ঠিত ঐক্যমতের উপর রয়েছেন, [তবে উক্ত মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় কিছু মুহাদ্দিস যথা ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. প্রমুখ এর মতে ২০ রাকআতই শ্রেয়])

যাই হোক, উপরোক্ত অকাট্য দলীলসমূহ দ্বারা তারাবীহের নামায় ২০ রাকআত হওয়া; ৮ রাকআত না হওয়া সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হল, অতএব এ নিয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। (বিশ রাআতের জন্য আরো দেখুন: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.৭৬৮৪, ৭৬৮৮, ৭৬৮৬, ৭৬৮৩, সুনানে বাইহাকী কুবরা হা.৪৩৯৫, ৪৯০৩)

জনাব নাসিরুদ্দীন আলবানী সাহেবের কাণ্ড

ভারতবর্ষে উপরোক্ত বিদআত মাথাচাড়া দিয়ে উঠার পর আরব-বিশ্বে শায়খ নসীব রেফায়ী নামে জনৈক আলেম সর্বপ্রথম এই বিদআতকে দালীলিক অবয়ব দেওয়ার ব্যর্থ-চেষ্টা করলে তৎকালীন আলেমগণ জোরালো-ভাবে সেটার খণ্ডন করে বই-পুস্তক রচনা করেন। এতে জনাব আলবানী সাহেবের আঁতে ঘা লেগে যাওয়ায় তিনি পাল্টা জবাবমূলক রেফায়ী সাহেবের সমর্থনে ১৩৭৭ হিজরীতে “তাসদীদুল ইসাবাহ” নামে একটি পুস্তক রচনা করেন; বইটি তার ভ্রান্তি-বিদ্যুতি এবং মুসলিম উম্মাহ ও ইমামগণের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও বিদ্বেষের জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে রয়েছে, এ ছাড়া বইটিতে উসূলে হাদীস, উসূলে ফিক্বহ ও জারহ-তা’দীল বিষয়ে তার লজ্জাজনক দৈন্য ও অপরিপক্কতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, এতদসত্ত্বেও আমাদের দেশের লা-মাযহাবী বন্ধুগণ তারাবীহ বিষয়ে কলুষিত এই বইটিকেই অন্ধের ন্যায় মাথায় তুলে রেখেছেন।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় ব্যাপারটি হল: শায়খ নসীব রেফায়ীর খণ্ডনে লিখিত সাড়া জাগানো কিতাব الأصابة في الانتصار للخلفاء الراشدة (আল ইসাবাহ ফিল ইনতিসার লিল খুলাফাইর রাশিদাহ) এর ৬১নং পৃষ্ঠায় পরিষ্কার লিখা হয়েছে:

"و لم يشذ أحد منهم بمنعها غير هذه الشرذمة التي ظهرت في زماننا كالشيخ ناصر وإخوانه."

“আমাদের এই যুগে গজিয়ে উঠা জনাব নাসিরুদ্দীন আলবানী ও তার সমমনা ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী ব্যতীত কেউই ২০ রাকআত তারাবীহকে অস্বীকার করে ভ্রান্তি ও বিচ্যুতিতে নিপতিত হয়নি।”

আশ্চর্যজনক হলো: এর জবাবে আলবানী সাহেবের পক্ষে কোন সাহাবী, তাবেয়ী, ফকীহ ইমাম বা কোন মুহাদ্দিস ইমামের উদ্ধৃতি তো দূরের কথা, তিনি কোন মসজিদের সন্ধান দিতেও সক্ষম হননি; যেখানে তারাবীহের নামায আট রাকআত হত, অনেক ঘাটাঘাটির পরও কোন গতান্তর না পেয়ে অবশেষে তিনি জুরী নামক অজ্ঞাত এক ব্যক্তির উদ্ধৃতিতে প্রকাশ্য দিবালোককে অস্বীকার করার ন্যায় মালেক রহ. সম্পর্কে বলে দিলেন যে, তিনি কিনা ২০ রাকআত পড়তে নিষেধ করেছেন, অথচ শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী উক্ত জুরী ইমাম মালেক রহ. এর অনেক পরবর্তী একজন লোক, তার কোন পরিচয় কিংবা ইমাম মালেক রহ. পর্যন্ত তার কোন সনদ বা সংশ্লিষ্টতা কোন কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না।

উপরন্তু মালেকী মাযহাবের মৌলিক গ্রন্থ এবং তদীয় ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক সংকলিত ‘আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা’তে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে:

‘তারাবীহের নামায বিতিরের তিন রাকআতসহ মোট ৩৯ রাকআত এবং তৎকালীন মদীনার গভর্নর সংখ্যা কমাতে চাইলে তিনি তাকে বারণ করে দেন।’ (আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা: ১/১৯৩, আরও দ্রষ্টব্য: বিদায়াতুল মুজতাহিদ:১/২৪৬, আল ইসতিযাকার:৫/১৫৭, আল মুনতাকা: ১/২০৮)

* বক্ষ্যমাণ বিষয়টি নিয়ে বর্তমান শতাব্দীতে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মাওলানা হাবীবুর রহমান আযমী রহ. ‘রাকআতে তারাবীহ’ নামক বস্তুনিষ্ঠ ও গবেষণা-ধর্মী একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, বইটি ১৩৭৭হি.তে প্রথম প্রকাশিত হয়, বইটিতে তিনি সাহাবা-যুগ থেকে নিয়ে লা-মাযহাবী কর্তৃক ৮ রাকআতের বিদআত চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে বারশত বছরের প্রতিটি শতাব্দীর আমালে মুতাওয়ারাস তথা উম্মাহর সম্মিলিত অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা এক এক শতাব্দী ধরে ধরে তিনি সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন, তারপরে অর্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গেলেও তাদের কেউ অদ্যাবধি তা খণ্ডন করতে সক্ষম হয়নি এবং আদৌ তা সম্ভবও নয়।

লা-মাযহাবী বন্ধুগণ কর্তৃক দলীলের মোড়কে কিছু অলীক দাবি ও সেগুলোর অসাড়া

১. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. এর একটি বর্ণনা-

عن أبي سلمة رضي الله عنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة..... الخ (صحيح مسلم) ১/২৫৪

‘আবু সালামাহ বলেন: যে, তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. কে জিজ্ঞাসা করেছেন, রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায কেমন হত? আয়েশা রা. প্রতিউত্তরে বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে এবং অন্য মাসে এগারো রাকআতের বেশি পড়তেন না।’ (সহীহ মুসলিম:১/২৫৪)

পর্যালোচনা

পাঠক মাত্রই বুঝতে পারছেন এটি তারাবীহ বিষয়ক কোন হাদীস নয় কারণ:-

ক) তারাবীহ শুধু রমযানে আদায় করা হয় আর তাহাজ্জুদ সারা বৎসর পড়া হয়, আর হাদীসটি সারা বৎসরের আমলের বর্ণনা, অতএব এটি হল তাহাজ্জুদ এর নামায। (ফাতাওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস:২/৩৩০)

খ) সাহাবাগণ আমলে নববী ও হাদীসে নববীর মর্ম সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত হওয়া সত্ত্বেও তারা কেউই এটিকে তারাবীহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেননি।

গ) স্বয়ং রাবী হযরত আয়েশা রা. চার খলীফার কোন এক খলীফার যুগেও তার এই হাদীসটিকে তারাবীহের ২০ রাকআতের সর্বসম্মত আমলের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে দাঁড় করাননি।

উপায়ান্তর না পেয়ে লা-মায়হাবী বন্ধুগণ তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই নামায হওয়ার দাবি করে বসলেন যা সাময়িক হাসির খোরাক যোগানো ছাড়া আর কোন কাজে আসল না, তথাপি এখানে এর কিছু অসাড়তা তুলে ধরা হচ্ছে:

ক) শরীয়তের দলীল চতুষ্টয়ের কোন একটি দ্বারাও তারা তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এক ও অভিন্ন প্রমাণ করতে পারেনি এবং পারবেও না।

খ) সমস্ত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমামগণ নিজ নিজ কিতাবে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় কায়ম করেছেন।

গ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় বলেছেন যে, একই নামাযের নাম এগারো মাস তাহাজ্জুদ আর বারতম মাসে সেটি তারাবীহ?

উক্ত হাদীস কেন্দ্রিক লা-মায়হাবী ভাইদের স্ববিরোধী কিছু কার্যকলাপ দেখুন:

ক) তারা হাদীসটি দ্বারা ৮ রাকআত তারাবীহ দাবি করলেও উক্ত হাদীসেই উল্লেখিত তিন রাকআত বিতির গ্রহণ করতে নারাজ।

খ) হাদীসে সারা বৎসরের কথা বলা হলেও রমযানের বাহিরে তাদের এ আমলটি দেখা যায় না।

ঘ) হাদীসে উক্ত আট রাকআত ঘরে আদায় করার কথা বলা হয়েছে; কিন্তু তারা মসজিদে গিয়ে পড়েন।

ঙ) হাদীসে জামাআত ব্যতীত একাকী আদায় করার কথা থাকলেও তারা জামাআতের সাথে পড়েন।

২. দ্বিতীয়ত তারা হযরত জাবের রা. এর সূত্রে একটি বর্ণনা পেশ করে থাকেন, আর সেটি হচ্ছে:

عن جابر رضي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ليلة ثمان ركعات والوتر ...
'রমযানের এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে আট রাকআত এবং বিতর পড়লেন।'

পর্যালোচনা:

ক) হাদীসটির একজন রাবী হলেন ইয়াকুব ইবনে আব্দুল্লাহ, আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. তার বর্ণিত একটি হাদীস সম্পর্কে লিখেন:

وهذا الحديث منكر جدا وفي إسناده ضعف ويعقوب هذا هو القمى وفيه تشيع ومثل هذا لا يقبل
تفرده. (البداية والنهاية ٣/٣٩٥)

‘হাদীসটি চরম পর্যায়ে মুনকার এবং এর সনদ যঈফ, এবং ইয়াকুব হল শীয়া মতাদর্শের লোক, আর এ ধরনের বিষয়ে তার তাফাররুদ (নিঃসঙ্গতা) অগ্রহণযোগ্য।’

এই তারাবীহ সংক্রান্ত রেওয়ায়াতটিতেও তিনি মুতাফাররিদ, তার রেওয়ায়েতটি উম্মতের ইজমা পরিপন্থী।

খ) আরেক রাবী ঈসা ইবনে জারিয়া একজন যঈফ রাবী, তার সম্পর্কে হাদীস বিশারদ ইমামগণের উক্তি নিম্নরূপ:

ইয়াহইয়া ইবনে মাস্নন রহ. বলেন, ‘সে কিছুই না’, নাসাঈ ও আবু দাউদ রহ. তাকে ‘মুনকারুল হাদীস’ বলেছেন, আল্লামা সাজী ও উকাইলী রহ. তাকে যঈফ বলেছেন, ইবনে আবী বলেন, তার ‘হাদীসগুলো অরক্ষিত’। (তাহযীবুল কামাল:২২/৫৮৮) অতএব, এসব উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈসা ইবনে জারিয়া একজন যঈফ রাবী। ফলে তার সূত্রে বর্ণিত উক্ত রেওয়ায়েতটি কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

গ) ইমাম ইবনে আদী রহ. তার উপরোক্ত হাদীসটিকে ‘গায়রে মাহফূয’ সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে আদী এর ভাষায় ‘গায়রে মাহফূয’ মুনকার বা বাতিল রেওয়ায়েতের ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। মুনকার হচ্ছে যঈফ হাদীসেরই একটি প্রকার, তবে তা এতই যঈফ যে, এর দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ বৈধ নয়।

দেখুন:- তাহযীবুল কামাল:১৪/৫৩৩-৫৩৪; আল কামিল {ইবনে আদী}:৬/৪৩৬; আয যুয়াফাউল কাবীর {উকাইল}:৩/৩৮৩; ইতহাফুল মাহারায বিআতরাফিল আশারায {ইবনে হাজার}:৩/৩০৯

ঘ) হাদীসটি সহীহ ধরে নিলে হযরত জাবের রা.ই সর্বপ্রথম ২০ রাকআতের বিপক্ষে হাদীসটি পেশ করতেন। অথচ তিনি এমনটি করেননি।

৩. তারা তৃতীয় দলীল হিসেবে উবাই ইবনে কা'ব রা. এর সূত্র দিয়ে একটি বিকৃত বিবরণ পেশ করে থাকেন, রেওয়ায়েতটি নিম্নরূপ :

عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ.

হাদীসটি সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে তার দুইজন ছাত্র বর্ণনা করেছেন। এক. মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ; দুই. ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা। মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ থেকে আবার তার পাঁচজন ছাত্র বর্ণনা করেছেন, যথা: ইমাম মালেক, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ অল -কাত্তান, আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ, ইবনে ইসহাক, আব্দুর রাজ্জাক। তবে এই পাঁচজনের বর্ণনা পাঁচ রকম। যাকে পরিভাষায় 'ইযতিরাব' বলা হয়। তাদের কেউ এগার রাকাতের কথা বর্ণনা করেছেন, কেউ তের রাকাতের কথা আবার কেউ একুশ রাকাতের কথা বর্ণনা করেছেন।

অপর দিকে সায়েব ইবনে ইয়াযীদদের অপর ছাত্র ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা থেকে এই হাদীসটি ইবনু আবী যিব ও মুহাম্মাদ ইবনে জাফর বর্ণনা করেছেন। আর তারা দুইজনই বিশ রাকাতের কথা বর্ণনা করেছেন। বিশ রাকাত সম্বলিত তাদের রেওয়ায়েতটি নিম্নরূপ:

بن أبي ذئب عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة

محمد بن جعفر قال : حدثني يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد قال : كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر

অর্থ: সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. বলেন আমরা উমর রা. এর যুগে বিশ রাকাত তারাবীহ পড়তাম এবং আলাদাভাবে বিতির পড়তাম। (সুনানে বাইহাকী, কুবরা হা. ৪৩৯৩, মা'রেফাতুস সুনান হা.১৪৪৩)

ইবনে আবী যিব রহ. এর রেওয়ায়েতটিকে ইমাম নববী, ইরাকী, সুয়ূতীসহ আরও অনেকে সহীহ বলেছেন। (তুহফাতুল আখইয়ার পৃ.১৯২, ইরাশাদুস সারী:৩/২৩৪, তুহফাতুল আহওয়াযী:২/৭৫)

আর মুহাম্মাদ ইবনে জাফরের রেওয়ায়েতকে মোল্লা আলী কারী রহ.শরহে মুআত্তাতে সহীহ বলেছেন (তুহফাতুল আহওয়াযী:২/৭৫)

তো দেখা-গেল, ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার দুই ছাত্র একই শব্দে হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. সূত্রে বিশ রাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন। অপর দিকে মুহাম্মাদ বিন

ইউসুফের পাঁচজন ছাত্র পাঁচ ধরনের রেওয়ায়েত করেছেন। যা উসূলে হাদীসের দৃষ্টিতে ‘মুযতারাব’ বলে গণ্য হয়। আর মুযতারাব হাদীস কোনো ইমামের মতে দলীল-যোগ্য নয়।

উপরন্তু হাদীসটি সহীহ হলে স্বয়ং উবাই ইবনে কা’ব রা. ২০ রাকআত না পড়িয়ে ৮ রাকআত পড়াতেন।

৪. চতুর্থত, একজন রাবী উমর রা. যুগের তারাবীহের বর্ণনা দিতে গিয়ে ২০ এর স্থলে ভুলক্রমে ৮ বলে ফেলেছেন আর এটিকেই লা-মায়হাবী বন্ধুগণ সানন্দে লুফে নিলেন, অথচ:

ক)পূর্বোল্লিখিত বিপুল পরিমাণ সহীহ বর্ণনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ইজমা ও ধারাবাহিক কর্মধারার আলোকে উমর রা. এর যুগে এবং পরবর্তী খুলাফাদের যুগে তারাবীহের নামায ২০ রাকআত হওয়াটা সু-প্রমাণিত, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

খ) ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. ও আরও বেশ কিছু মুহাক্কিক আলিম বলেছেন যে, ২০ এর স্থলে ১১ উল্লেখ করা বর্ণনাকারীর ভুল। (দেখুন: আল ইসতিযকার:৫/১৫৬; রাকআতে তারাবীহ:পৃ. ১১-১২)

শেষকথা:

“একটি সহীহ হাদীসের অপব্যাখ্যা, দু’টি পরিত্যক্ত ও একটি বিভ্রান্ত বর্ণনা” গোঁজামিল মার্কী এতটুকুন পুঁজি নিয়ে বিপুল পরিমাণ নির্ভরযোগ্য ও অকাট্য বর্ণনার মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে পরবর্তী সমস্ত যুগের ইমামগণের ঐক্যমত্যে প্রতিষ্ঠিত অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা খেলনার পিস্তল নিয়ে বাঘ শিকারে বেরিয়ে পড়ার নামান্তর, সুস্থ মস্তিষ্ক-সম্পন্ন কোন লোক যা কখনো কল্পনাও করতে পারেন না।

তাই লা-মায়হাবী ভাইদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি: মুসলিম উম্মাহর এই দুর্দশার যুগে এভাবে অপপ্রচার ও প্রোপাগান্ডার বিষবাস্প ছড়িয়ে সরলমনা মুসলমানদেরকে আর বিভ্রান্ত না করে শাস্ত্র সত্যের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করুন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে বাস্তব সত্য গ্রহণ করার ও তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কাযা নামায পড়ার বিধান

কুরআন ও সুন্নাহয় তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের আলোচনার পর নামাযের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। চাই তা সময়মত আদায় করা হোক অথবা ওয়াক্তের পর কাযা করা হোক। বস্তুত শরীয়তে ঈমানের পরেই নামাযের স্থান এবং

নামায ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। কেউ যদি কোনো কারনে সময়মত নামায পড়তে না পারে তাহলে পরবর্তীতে তা কাযা করা জরুরী।

এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ থেকে দলীল উল্লেখ করা হলো:

(১) পবিত্র কুরআনের সূরায়ে নিসার ১০৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ‘ নিঃসন্দেহে মুমিনদের প্রতি নামায অপরিহার্য রয়েছে, যার সময়-সীমা নির্ধারিত’। এই আয়াতে নামাযের সময়-সীমা নির্ধারিত হওয়ার বিষয়টি যেমন উল্লেখিত হয়েছে, তেমনি নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা না হলে পরবর্তীতে উক্ত নামায কাযা করার বিষয়টিও পরোক্ষভাবে উল্লেখিত হয়েছে। কারণ এটা আল্লাহ তাআলার ঋণ, আর ঋণ সময়মত আদায় না করতে পারলে পরবর্তীতে তা আদায় করা জরুরী। যেমন সামনের হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে:

(২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এক মহিলা নবীজি এর নিকট এসে বলল, আমার মা মাম্বত করেছিলেন যে, তিনি হজ্ব করবেন। কিন্তু তা পুরা করার আগেই তিনি মারা যান। (এখন আমার করণীয় কী?) নবীজি ইরশাদ করেন যে, حجي عنها أريت لو كان على امك دين اكننت قاضية؟ اقضوا الله فله احق بالوفاء ‘তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্ব করে নাও। বল তো, যদি তোমার মা কারো নিকট ঋণী হতেন তুমি কি তার ঋণ পরিশোধ করতে? মহিলা বলল, হ্যাঁ, তখন প্রতি-উত্তরে নবীজি ইরশাদ করেন যে, তবে তোমরা আল্লাহর ঋণকেও পরিশোধ কর। কেননা তিনি তাঁর প্রাপ্য পাওয়ার অধিক উপযুক্ত। (সহীহ বুখারী ১/২৪৯, নাসাঈ ২/২)

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল, যে ইবাদাত বান্দার উপর ফরয বা অবশ্যকর্তব্য তা বান্দার উপর আল্লাহ তাআলার পাওনা বা ঋণ। এই ঋণ থেকে দায়মুক্তির পথ হলো তা আদায় করা। যেমনিভাবে মানুষের পাওনা ঋণের নির্ধারিত সময় পার হওয়ার দ্বারা মানুষের ঋণ থেকে দায়মুক্ত হওয়া যায় না, তেমনি নির্ধারিত সময় পার হওয়ার দ্বারা আল্লাহ তাআলার ঋণ থেকেও দায়মুক্ত হওয়া যায় না। আর শরীয়তে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত নামাযের ব্যাপারে এই মূলনীতি যে পুরোপুরি প্রযোজ্য হবে, জ্ঞানী মাত্রই তা বুঝতে সক্ষম।

৩. এক রাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে সফর করছিলেন। শেষ রাতে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে সফর বিরতি দিলেন। হযরত বিলাল রা. কে ফজরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিলেন। অতঃপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। এ দিকে হযরত বিলাল রা.এর তন্দ্রা এসে গেল। ফলে সবার ফজরের নামায কাযা হয়ে গেল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জেগে সূর্য উঠার কিছুক্ষণ পর সবাইকে নিয়ে ফজরের নামায কাযা করলেন। অন্যত্র বর্ণিত

হয়েছে, ঘুম বা বিস্মৃতির কারণে যার নামায ছুটে গেল, যখন সে জাগ্রত হবে তখন যেন সে তা আদায় করে নেয়। (বুখারী হা.নং ৫৯৭, মুসলিম হা.নং ৬৮১)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, সেই দুই রাকআত যা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাযা হিসাবে আদায় করেছেন, আমার নিকট তা সমগ্র দুনিয়ার মালিকানা লাভ করার চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। (মুসনাদে আহমাদ ৪/১৮১, মুসনাদে আবী ইয়ালা ৩/২২-২৩, হা. নং ২৩৭১)

৪. খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফিরার দিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে বনু কুরাইযা অভিমুখে পাঠানোর সময় বললেন, لا يصلي احد العصر الا في بني قريظة ‘তোমাদের কেউ যেন বনী কুরাইযায় না পৌঁছে আছরের নামায না পড়ে’। (সহীহ বুখারী ১/১২৯, হা.নং ৪১১৯, সহীহ মুসলিম ২/৯৬) সাহাবায়ে কেরাম রা. রওনা হলেন। পথে আছরের নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়ার উপক্রম হলে কতক সাহাবী পথেই সময়ের ভিতর আছর পড়ে নেন। আর কতক সাহাবী বনী কুরাইযায় পৌঁছার পর আছরের নামায কাযা পড়েন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনা শুনলেন। কিন্তু পরে কাযা আদায়কারীগণকে একথা বলেননি যে, নামায শুধুমাত্র নির্ধারিত সময়েই আদায়যোগ্য। সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এর কোনো কাযা নেই।

সুতরাং এই হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, কোনো কারণ বশত নামায ওয়াস্ত মত না পড়তে পারলে সেই নামায অবশ্যই কাযা পড়তে হবে। এ কারণে যারা কাযা পড়েছিলেন নবীজি তাদেরকে সমর্থন করেছিলেন।

৫. স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খন্দকের যুদ্ধের সময় কয়েক ওয়াস্তের নামায কাযা হয়ে গিয়েছিল। তথা যুদ্ধের কারণে সময় মত পড়া সম্ভব হয়নি। এই নামাযগুলি তিনি কাযা হিসাবে পড়ে নিয়েছিলেন। (বুখারী ১/১৬২, ২/৩০৭)

৬. এ প্রসঙ্গে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দলীল হলো ইজমায়ে উম্মত। মুসলিম উম্মাহর সকল মুজতাহিদ ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, ফরয নামায নির্ধারিত সময়ে আদায় করা না হলে সময়ের পরে তা কাযা করতে হবে। এ ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে কাযা করা বা ওয়রবশত কাযা হয়ে যাওয়া উভয় প্রকারের বিধানই সমান।

যেমন, মালেকী মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম, ইবনে আব্দুল বার রহ. বিনা ওয়রে অনাদায়কৃত নামায কাযা করা অপরিহার্য হওয়ার সপক্ষে শরয়ী প্রমাণাদি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

ومن الدليل على ان الصلوة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها كالصائم سواء وان كان اجماع
الامة الذين امرمن شذ منهم بالرجوع اليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغنى عن الدليل في
ذلك.... الاستذكار ١/٣٠٢

‘ফরয রোযার মত ফরয নামাযও সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে কাযা করতে হয়। এ ব্যাপারে যদিও উম্মতের ইজমাই যথেষ্ট দলীল। যার অনুসরণ করা ঐসব বিচ্ছিন্ন মতের প্রবক্তাদের জন্যও অপরিহার্য ছিল। তারপরও কিছু দলীল উল্লেখ করা হলো, যথা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীসমূহ.... (আলইসতিযাকার:১/৩০২-৩০৩)

এছাড়া হাদীসের প্রত্যেক কিতাবে ‘বাবু কাযাইল ফাওয়ায়েত’ তথা ছুটে যাওয়া নামায কাযা করার অধ্যায় নামে কাযা নামায পড়ার পদ্ধতির ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। কাযা নামায আদায় করা জরুরী হওয়ার ব্যাপারে এটাও মজবুত প্রমাণ।

তাছাড়া এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস ও সাহাবা কেরামের ফাতাওয়া রয়েছে। বেশি দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় এখানে শুধুমাত্র একটি আয়াত ও কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো। এর দ্বারাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, কাযা নামায আদায় করা জরুরী। এ ব্যাপারে উম্মতের নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরাম একমত।

তারপরও আমাদের কিছু দ্বীনী ভাই যারা নিজেদেরকে ‘আহলুল হাদীস’ বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন, তারা কাযা নামায আদায়ের বিধানকে সহীহ হাদীসের খেলাফ মনে করেন এবং মুসলিম জনসাধারণকে কিছু হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা বিভ্রান্ত করে থাকেন। এ সম্পর্কে তারা যে-সব দলীল পেশ করে থাকেন তা নিম্নরূপ:

(১) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, **من ترك الصلوة فقد كفر** ‘যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল সে কাফের হয়ে গেল’। আর অপর এক হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, **ان الاسلام يهدم ماكان قبله وان الهجرة تهدم ماكان قبلها** ‘ইসলাম গ্রহণ করলে অতীত গুনাহসমূহ আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেন। অনুরূপভাবে হিজরত করলেও হিজরতের পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।’

সুতরাং উক্ত দুই হাদীসের আলোকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, নামায পরিত্যাগ করার কারণে মুসলমান কাফের হয়ে যায়। এখন পুনরায় মুসলমান হওয়া তার কর্তব্য। যখন সে পুনরায় মুসলমান হয়ে যাবে তখন তার কাযা নামায আদায় করার প্রয়োজন নেই। কারণ মুসলমান হওয়ার দ্বারা আগের সব গুনাহ মাফ হয়ে গেছে।

অথচ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কোনো ইমাম বা হাদীস ব্যাখ্যাকারী এই হাদীস দুইটির এ জাতীয় ব্যাখ্যা করেন নি। একমাত্র

আহলুল হাদীস ভাইয়েরাই এই ব্যাখ্যা করেছেন। এ উভয় হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো

প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যা: যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করল তার এই কাজটি কেমন যেন কাফেরদের কাজের মত হলো। কিন্তু লোকটি এর দ্বারা কাফের হবে না।

দ্বিতীয় হাদীসের ব্যাখ্যা: কোনো অমুসলিম মুসলমান হলে আল্লাহ তাআলা মেহেরবানী করে তার অতীত গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু কোনো ইমাম এই অর্থ করেননি যে, কোনো মুসলমান নামায ত্যাগ করে কাফের হয়ে পুনরায় মুসলমান হলে তার পিছনের কাযা নামায পড়া লাগবে না। বরং পূর্বে উল্লেখিত আয়াত, হাদীস ও ইজমায়ে উন্মত দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হলো যে, উমরী কাযা নামায আদায় করা তেমনি ফরযে আইন যেমনটি সময়মত আদায় করা ফরযে আইন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে উক্ত বিধানের ব্যাপারে যত্ববান হওয়ার তাওফীক দান করুন।

ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের দলীল

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি না বারটি এ সম্পর্কে মাযহাবের ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ রহ. এর মতে ঈদের নামাযে বার তাকবীর দিতে হবে। আর ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে উভয় ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি।

ছয় তাকবীরের দলীলের আলোচনার আগে জেনে নেওয়া উচিত যে, তাকবীর সংক্রান্ত ইমামদের এ ইখতেলাফ শুধু উত্তম অনুত্তম নিয়ে। অর্থাৎ যারা বার তাকবীরের কথা বলেন তাদের মতে ছয় তাকবীর দিলেও নামায হয়ে যাবে। কিন্তু বার তাকবীর দেওয়া উত্তম। এমনিভাবে যারা ছয় তাকবীরের কথা বলেন তাদের মতে বার তাকবীর দিলেও নামায হয়ে যাবে। তবে উত্তম হল ছয় তাকবীর দেওয়া। কেননা উভয় পদ্ধতি সাহাবাদের আমল থেকে সহীহ সনদে সাব্যস্ত। তাই এক মত গ্রহণ করলে অপরটিকে তুচ্ছজ্ঞান করা যাবে না। এ সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বেশ সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেন: ‘ সালফে সালেহীন এর মধ্য থেকে প্রত্যেকেই শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে নামায, দুআ, যিকির ইত্যাদি আদায় করেছেন। আর প্রত্যেক ইমামের ছাত্রগণ ও তার দেশবাসী উক্ত ইমামের অনুসৃত পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। কখনো প্রত্যেক ইমামের অনুসৃত পদ্ধতি (জায়েয ও উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে) এক মানের হয়, আবার কখনো কারো অনুসৃত পদ্ধতি অপরের পদ্ধতি থেকে উত্তম হয়ে থাকে... এমন ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যকর্তব্য হল, শরীয়ত সমর্থিত দলীল ছাড়া একের মতকে অন্যের মতের উপর প্রাধান্য না দেয়া। তবে হ্যাঁ, দলীলে শরয়ীর ভিত্তিতে যদি কোনো এক পদ্ধতি প্রাধান্য লাভ করে তখন যে ব্যক্তি অন্য কোনো

জায়েয পদ্ধতির অনুসরণ করছে তাকে কোনোরূপ দোষারোপ করা যাবে না।’
(আদাবুল ইখতিলাফ ১১৪ পৃ.)

এ হল উত্তম-অনুত্তম পর্যায়ের মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর মতামত। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. আমাদের আহলে হাদীস বন্ধুদের কাছে মাননীয় ও বরণীয়। তা সত্ত্বেও তারা আজ নামায সংক্রান্ত এমন সব উত্তম-অনুত্তম পর্যায়ের ইখতেলাফ নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করেছে যে-সব ইখতেলাফ শত শত বছর পূর্বে মিটে গেছে। এ সব ইখতিলাফী মাসআলা নিয়ে তারা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। সরলপ্রাণ মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। ভারত উপ-মহাদেশ হানাফী মাযহাবের অনুসারী মুসলমানদের আবাসস্থল। এখানের মুসলমানদের অন্তরে হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন হুকুম আহকাম সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করাই বোধ হয় বর্তমান আহলে হাদীস বন্ধুদের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব। আহলে হাদীস বন্ধুদের পক্ষ থেকে প্রোপাগান্ডার শিকার একটি মাসআলা হলো ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের মাসআলা। আহলে হাদীস বন্ধুরা বলতে চায় ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোনো হাদীস নেই। অথচ বার তাকবীরের পক্ষে অনেক হাদীস আছে। তাই ঈদের নামাযে বার তাকবীরই দিতে হবে। ছয় তাকবীর দিলে নামায হবে না।

আমরা ইনশাআল্লাহ ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের যথার্থতা উল্লেখ করার চেষ্টা করব, যাতে হানাফী মাযহাবের অনুসারী মুসলমান ভাইদের আস্থা হানাফী মাযহাবের উপর অটুট থাকে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা আর কোনো হানাফী ভাইকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

জেনে নেয়া উচিত যে, হাদীসের মধ্যে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরকে বিভিন্নভাবে বুঝানো হয়েছে। কোনো হাদীসে ঈদের নামাযে নয় তাকবীর বলা হয়েছে। এমনিভাবে কোনো হাদীসে দুই রাকাআতে চারটি করে মোট আট তাকবীরের কথা এসেছে। কিন্তু কোনো ইমামই ঈদের নামাযে নয় বা আট তাকবীরের প্রবক্তা নন। তাহলে বুঝাগেল নয় বা আটের বিশেষ কোনো ব্যাখ্যা রয়েছে। মূল হাদীস উল্লেখ করার আগে সেই ব্যাখ্যা জেনে নিলে সামনের কথা বুঝা সহজ হবে।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, ঈদের নামাযের প্রথম রাকাআতে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীরসহ মোট তাকবীর হয় পাঁচটি। আর দ্বিতীয় রাকাআতে রুকুর তাকবীরসহ তাকবীর হয় চারটি। $5+4=9$ । হাদীসে যেখানেই নয় তাকবীরের কথা বলা হয়েছে সেখানে নয় এর ব্যাখ্যা এটাই। অর্থাৎ দুই রাকাআতে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর আর দুই রাকাআতের রুকুর দুই তাকবীর এবং তাকবীরে তাহরীমার এক তাকবীরসহ মোট নয় তাকবীর। আর চার চার আট তাকবীরের ব্যাখ্যা হল, প্রথম রাকাআতে রুকুর তাকবীর বাদ দিয়ে অতিরিক্ত তিন তাকবীর এবং তাকবীরে তাহরীমাসহ মোট তাকবীর চারটি। আর দ্বিতীয় রাকাআতে রুকুর তাকবীর ও

অতিরিক্ত তিন তাকবীরসহ মোট তাকবীর চারটি। $8+8=৮$ । এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাদীসের যেখানেই দুই রাকাআতে চারটি করে আট তাকবীরের কথা বলা হয়েছে, সেখানে মূলত অতিরিক্ত ছয় তাকবীরই উদ্দেশ্য। এখন আমরা হাদীস উল্লেখ করছি:

১. عن القاسم ابى عبد الرحمن قال: حدثني بعض اصحاب النبی صلى الله عليه وسلم قال: صلى بنا النبی صلى الله عليه وسلم يوم عيد فکبر اربعا واربعاً ثم اقبل علينا بوجهه حين انصرف فقال: لاتنسوا تکبیر الجنائز و اشار باصابعه وقبض ابهامه. رواه الطحاوی وقال هذا حديث حسن الاسناد.

‘প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবু আব্দুর রহমান কাসিম বলেন, আমাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একজন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন আমাদের নামায পড়ান এবং চারটি করে তাকবীর দেন। নামায শেষে আমাদের দিকে তাকিয়ে ইরশাদ করেন ‘ভুলো না যেন, তারপর হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলি বন্ধ করে বাকি চার আঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করে বললেন, জানাযার তাকবীরের মত (ঈদের নামাযেও চারটি করে তাকবীর)। ইমাম তহাবী রহ. এই হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (তহাবী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃ.৩৭১)

২. عن كردوس قال: كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يكبر في الاضحى والفطر تسعا تسعا. يبدأ فيكبر اربعا ثم يقرأ ثم يكبر واحدة فيركع بها ثم يقوم في الركعة الاخرة فيبدأ فيقرأ ثم يكبر اربعا يركع باحداهن. قال الهيثمى: رواه الطبرانی في الكبير ورجاله ثقات.

‘বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত কুরদূস রহ. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের নামাযে নয়টি করে তাকবীর দিতেন। নামায শুরু করে চারটি তাকবীর দিতেন (তিনটি অতিরিক্ত আর একটি তাহরীমার) তারপর কেরাআত পড়তেন। অতঃপর এক তাকবীর বলে রুকু করতেন। এরপর দ্বিতীয় রাকাআতে দাঁড়িয়ে কেরাত পড়ে মোট চারটি তাকবীর দিতেন যার একটি দিয়ে রুকু করতেন।’ এই হাদীস সম্পর্কে হাফেজে হাদীস আল্লামা হাইছামী রহ. বলেন, এই হাদীসের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। (মাজাউয্যাওয়ায়েদ ২/৩৬৭ হ.নং ৩২৪৯)

অতএব, হায়ছামী রহ. এর উক্তি অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ। আর আল্লামা নিমাতী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, হাসান ও সহীহ উভয় প্রকারের হাদীসই আমলের ক্ষেত্রে একই পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য।

৩. عن علقمة والاسود قالاً: كان مسعود جالسا وعنده حذيفة وابوموسى رضى الله عنهم فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في صلاة العيد فقال حذيفة سل الشعري فقال الاشعري

سل عبد الله فانه اقدمنا واعلمنا، فسأله، فقال ابن مسعود يكبر اربعا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع فيقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر اربعا بعد القراءة.

‘আলকমা ও আসওয়াদ রহ. বলেছেন, একদা ইবনে মাসউদ, হুযাইফা ও আবু মুসা আশআরী রা. বসে ছিলেন। তখন সাঈদ ইবনুল আস তাঁদের নিকট ঈদের নামাযে তাকবীরের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে হুযাইফা রা. বললেন, আশআরী ভাইকে জিজ্ঞেস কর। আর আবু মুসা আশআরী রা. বললেন, ইবনে মাসউদ রা.কে জিজ্ঞেস কর, কেননা তিনি আমাদের মধ্যে প্রবীণ ও বেশি ইলমের অধিকারী। সর্বশেষে সাঈদ ইবনুল আস ইবনে মাসউদ রা.কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, নামায শুরু করে চারটি তাকবীর দিবে (তাকবীরে তাহরীমাসহ অতিরিক্ত তিনটি) তারপর কেরাআত পড়ে তাকবীর দিয়ে রুকুতে যাবে। অত:পর দ্বিতীয় রাকাআতে দাঁড়িয়ে প্রথমে কেরাআত পড়বে তারপর চারটি তাকবীর দিবে (অতিরিক্ত তিনটি রুকুর একটি)। মুহাল্লা বিল আসার ৩/২৯৫, ইবনে হাযাম যাহেরী ও নিমাতী রহ, এই হাদীসের সনদকে সহীহ বলেছেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক হা.৫৬৮৭ ‘আছারুস সুনান পৃ.৩১৫)

8. عن عبد الله بن الحارث (هو ابن نوفل) قال: كبر ابن عباس رضى الله عنه يوم العيد في الركعة الاولى اربع تكبيرات سوى تكبيرة الصلاة. (اخرجه ابن حزم الظاهري في المحلى بالاثار 295/3 دارالكتب. وقال في سند هذا الاثر و الاثر الذى قبله: هذان اسنادان في غاية الصحة.

‘আব্দুল্লাহ বিন হারেস বিন নাওফেল বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ঈদের দিন প্রথম রাকাআতে চারটি তাকবীর দেন অত:পর কেরাআত পরেন, এরপর রুকু করেন। দ্বিতীয় রাকাআতে দাঁড়িয়ে প্রথমে কেরাআত পড়লেন এরপর নামাযের অন্যান্য তাকবীর ছাড়া অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর দিলেন।’ ইবনে হাযাম রহ. এই হাদীসটি এবং এর পূর্বে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বলেন, এই উভয় হাদীসের সনদ খুব সহীহ। (মুহাল্লা বিল আছার ৩/২৯৫)

5. اخرج ابن ابى شيبه عن يحيى بن سعيد القطان عن اشعث عن محمد بن سيرين عن انس رضى الله عنه انه كان يكبر في العيد تسعاً...

‘ইবনে আবী শাইবা ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান থেকে তিনি আশআছ থেকে তিনি মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস রা. ঈদের নামাযে মোট নয় তাকবীর দিতেন।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১/৪৯৫)

এই আছারের রাবী ইবনে আবী শাইবা, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান এবং মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন সকলেই সুপ্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস। আর আশআছ সম্পর্কে ইমাম জামালুদ্দীন মিনযী রাহ. বলেন:

هو اشعث بن عبد الملك، قال يحيى بن سعيد: هو عندى ثقة مأمون، وقال ابن

معين: اشعث ثقة وكذلك قال النسائي، وقال ابو حاتم: لا بأس به.

‘তার পিতার নাম আব্দুল মালেক। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রাহ. তার সম্পর্কে বলেন, তিনি আমার মতে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল। ইবনে মাঈন রহ. বলেন, আশআছ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, ইমাম নাসাঈ ও তার সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন। আর ইমাম আবু হাতেম রহ. বলেছেন, (হাদীসের ক্ষেত্রে) তার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামাল ২/২৭৯) এই আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, এই হাদীসটিও সহীহ।

বিশিষ্ট যে-সকল সাহাবা কেরাম রা. থেকে ছয় তাকবীরের বর্ণনা পাওয়া যায় তাদের কয়েক জনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১. হযরত উমর রা.
২. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.
৩. হযরত আনাস বিন মালেক রা.
৪. হযরত আবু মূসা আশআরী রা.
৫. হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা.
৬. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.
৭. হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান রা.
৮. হযরত আবু মাসউদ আনসারী রা.

মারফু হাদীস ও আসারে সাহাবা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েগেল যে, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের বিষয়টি হাদীস ও আসারে সাহাবা দ্বারা প্রমাণিত। এতদ্ব সত্ত্বেও যারা ছয় তাকবীর নিয়ে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তারা মূলত মুসলিম সমাজে অনৈক্য, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজে ইহুদী-খ্রিষ্টানদেরকে সাহায্য করছে।

বার তাকবীরের কথা

বার তাকবীর সম্পর্কে হাদীসের কিতাবে একাধিক মারফু হাদীস পাওয়া যায়। কিন্তু একটি মারফু হাদীসের সনদও সহীহ নয়। ইমাম আহমাদ বার তাকবীরের প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও বলেছেন, ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فى تكبير العيدين নামাযে তাকবীর সংখ্যা সম্পর্কে কোনো সহীহ মারফু হাদীস নেই।’ (নসরুর রায়হ: ৩/২৮৯) তবে হ্যাঁ, হযরত আবু হুরাইরা রা. এর আমল দ্বারা বার তাকবীর সহীহভাবে সাব্যস্ত রয়েছে। তাই যারা কোনো ইমামের মাযহাব মোতাবেক বার তাকবীরের উপর আমল করে তাদের আমলও সঠিক। তাদের আমলকে ভুল বলার কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ার বিধান

লা-মাযহাবী বন্ধুরা আজকাল বলে বেড়াচ্ছে যে, ‘জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়া জরুরী। সূরা ফাতেহা না পড়লে জানাযার নামায শুদ্ধ হবে না। যারা জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ে না তাদের জানাযার নামায সহীহ হবে না।’ তাদের এসব কথা শুনে সরলমনা হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা বিভ্রান্ত হচ্ছে, সংশয়ে নিপতিত হচ্ছে। তাদের সংশয় দূর করার জন্য আমাদের এই প্রয়াস। আমরা এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে হাদীস, আসারে সাহাবা, আসারে তাবেঈ এবং ফিকহী উদ্ধৃতি দিয়ে একথা প্রমাণ করে দেখাব যে, জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। সূরা ফাতেহা না পড়লেও জানাযার নামায সহীহ হবে যেমনটি হানাফী মাযহাবের বিধান।

নিম্নে হানাফী মাযহাবের ফিকহের প্রসিদ্ধ কিতাব ‘আলহিদায়াহ’ এর বরাতে হানাফী মাযহাব মোতাবেক জানাযা নামাযের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো:

قال صاحب الهداية: والصلاة ان يكبر تكبيرة يحمدالله عقيها ثم يكبر تكبيرة يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت و للمسلمين ثم يكبر الرابعة ويسلم. الهداية كتاب الجنازات فصل في الصلاة على الميت.

হেদায়ার গ্রন্থকার বলেন, ‘জানাযার নামায নিম্নরূপ; প্রথমে একটি তাকবীর দিবে, তাকবীরের পর আল্লাহর হামদ ও সানা পড়বে, এরপর আরেকটি তাকবীর দিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ পড়বে, অতঃপর আরেকটি তাকবীর দিয়ে নিজের জন্য, মৃত ব্যক্তির জন্য ও অন্যান্য মুসলমানের জন্য দুআ করবে।’ (আল-হেদায়াহ জানাযা অধ্যায়।)

হেদায়া গ্রন্থের ভাষ্যকার আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. বলেন,

لا يقرأ الفاتحة الا ان يقرأها بنية الثناء ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح القدير ٢/٥٢ رشيدية كتب خاتمة

‘জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়বে না। কেননা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জানাযায় কেরাত পড়া প্রমাণিত নেই। তবে হামদ ও সানার নিয়তে সূরা ফাতেহা পড়া যেতে পারে।’ ফাতহুল কাদীর ২/৮৫

ইমাম মালেক রহ. এর মতেও জানাযার নামাযে ফাতেহা পড়তে হয় না। এ-সম্পর্কে মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব ‘মুদাওওয়ানাতুল কুবরা’র বক্তব্য নিম্নরূপ:

قلت لعبد الرحمن بن القاسم: اى شىء يقال على الميت فى قول مالك؟ قال: الدعاء للميت, قلت: فهل يقرأ على الجنازة فى قول مالك؟ قال: لا .

‘ইমাম সাহনুন বিন সাঈদ রহ. বলেন, আমি আমার উস্তাদ আব্দুর রহমান বিন কাসেমকে জিজ্ঞাসা করলাম, মালেক রহ. এর মতানুযায়ী জানাযার নামাযে কি পড়তে হয়? তিনি বললেন, জানাযার নামাযে মাইয়েতের জন্য দুআ করতে হয়।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম জানাযার নামাযে কুরআন পড়া যাবে কি? তিনি বললেন, না।’ (মুদাওওয়ানাতুল কুবরা ১/২৫১)

জানাযার নামাযে ফাতেহা পড়তে হবে না, এ সম্পর্কীয় হাদীস

প্রথম দলীল: হযরত আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস:

اخرج مالك في الموطا عن سعيد بن ابى سعيد المقبرى عن ابيه انه سأل اباهريرة رضى الله عنه كيف تصلى على الجنائز؟ فقال ابوهريرة: انا لعمر الله اخبرك اتبعها من اهلها فاذا وضعت كبرت الله وحمدت الله وصليت على نبيه ثم اقول اللهم انه عبدك ابن عبدك... (الموطا لمالك برقم ২৫৮: , قال في اعلاء السنن : ورجاله رجال الجماعة الا ان سعيدا تغير موته بربع سنين, الى ان قال: ان مثل مالك لا يروى عنه في التغير. اعلاء السنن (২৫৫/৫)

‘হযরত সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ আল-মাকবুরী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আবু হুরাইরা রা.(মৃত:৫৭হি.) কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি কীভাবে জানাযা পড়েন? আবু হুরাইরা রা. বললেন, আমি তোমাকে জানাচ্ছি, আমি মাইয়েতের সাথে-সাথে আসি, এরপর যখন খাটিয়া রাখা হয় তখন (জানাযার নামাযের) তাকবীর দিয়ে হামদ-ছানা ও দুরুদ পড়ি এরপর এই দুআ পড়ি اللهم انه عبدك ابن عبدك... (মুআত্তা মালেক হা.নং ২৫৮)

দ্বিতীয় দলীল: হযরত আবু হুরাইরা রা. এর আরেকটি বর্ণনা:

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.

قال صاحب اعلاء السنن: رواه ابوداؤد و صححه ابن حبان كذا في بلوغ المرام. وقال ايضا: في سند ابى داؤد محمد ابن اسحاق وقد عنعنهم, ولكن قال في التلخيص الحبير: لكن اخرجه ابن حبان من طريق اخرى عنه مصرحا بالسماع. اعلاء السنن ২৬৮/৫ اشرفية بك (قال راقم الحروف: فالحديث حسن على الاقل)

‘আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযা পড় তখন তার জন্য এখলাহের সাথে দুআ কর।’ (সুনানে আবু দাউদ হা.নং ৩১৯৯)

এই হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতের জন্য দুআ করতে বলেছেন, কেরাআত পড়তে বলেননি। তাই জানাযার নামাযে কোনো ধরণের কেরাআত পড়া যাবে না।

তৃতীয় দলীল: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর আমল:

عن نافع ان ابن عمر رضى الله عنه كان لا يقرأ في الصلاة على الميت.

‘বিশিষ্ট তবেই নাফে রহ. বর্ণনা করেন, ইবনে উমর রা. জানাযার নামাযে কেরাআত পড়তেন না।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং ১১৫২২, শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা এর তাহকীক।)

চতুর্থ দলীল: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.(মৃত:৩২হি.) এর বর্ণনা:

عن ابن مسعود رضى الله عنه انه سئل عن صلاة الجنابة هل يقرأ فيها؟ فقال لم يوقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قولاً ولا قراءة وفي رواية دعاء ولا قراءة...

‘ইবনে মাসউদ রা. কে জিজ্ঞেস করা হল, জানাযায় কোনো কেরাআত পড়তে হবে কি না? তিনি বললেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযায় পড়ার জন্য কোনো কথা বা কেরাআত নির্ধারিত করে দেননি। আরেক বর্ণনায় আছে, কোনো দুআ বা কেরাআত নির্ধারিত করে দেননি। (উমদাতুল কারী ৬/১৯৪)

এই হাদীস দ্বারা বুঝে আসে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়তে বলে যাননি। কেননা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযায় যদি সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব করে দিতেন, তাহলে ইবনে মাসউ রা. তা অবশ্যই জানতেন। কারণ তিনি সফরে-হযরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাথে থাকতেন।

পঞ্চম দলীল: হযরত ফুয়ালা বিন উবাইদ রা.(মৃত:৫৩হি.) এর বর্ণনা:

عن موسى ابن علي عن ابيه قال: قلت لفضالة بن عبيد رضى الله عنه (هو صحابي جليل اسلم قديماً شهد احداً ومابعدها من المشاهد توفي سنة ثلاث وخمسين. الاصابة 28/8) هل يقرأ على الميت شيء؟ قال: لا.

‘মূসা বিন উলাই তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ফুয়ালা বিন উবাইদ রা. কে জিজ্ঞাসা করলাম, জানাযার নামাযে কোনো কেরাআত পড়তে হবে কি? তিনি বললেন, না কোনো কেরাআত পড়তে হবে না।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং ১১৫২৫)

ষষ্ঠ দলীল: উল্লেখিত সাহাবা কেরাম রা. ছাড়া আরো কয়েকজন বড় বড় সাহাবা রা. জানাযায় সূরা ফাতেহা পড়তে নিষেধ করেছেন। ইমাম সাহনুন বিন সাঈদ মালেকী আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব থেকে বর্ণনা করেন-

قال ابن وهب عن رجال من اهل العلم عن عمر بن الخطاب و علي بن ابي طالب و عبد الله بن عمر و فضالة بن عبيد و ابي هريرة و جابر بن عبد الله و وائلة بن الاسقع... انهم لم يكونوا يقرعون في الصلاة على الميت .

‘ইবনে ওয়াহাব সাহাবা কেরামের মধ্য থেকে বড় মাপের আলেম সাহাবীগণ যেমন: হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব, হযরত আলী ইবনে আবী তালেব, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত ফুযালা বিন উবাইদ, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ, হযরত ওয়াসেলা বিন আসকা’ প্রমুখ সাহাবা কেরাম রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা জানায়ার নামাযে কেরাআত পড়তেন না।’ (মুদাওওয়ানাতুল কুবরা ১/২৫১, দারুল বায)

যে-সব তাবেরী ইমামগণ জানাযায় ফাতেহা পড়তে নিষেধ করেছেন

১. বিশিষ্ট সাহাবী আমের আশ্শা‘বী রহ.(মৃত:১০৩)

عن أبي هاشم عن الشعبي قال: التكبير الأولى على الميت ثناء على الله و الثانية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و الثالثة دعاء للميت والرابعة تسليم.

‘আবু হাশেম ইমাম শা‘বী থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম শা‘বী বলেছেন, জানাযার প্রথম তাকবীর আল্লাহ তাআলার ছানা পড়ার জন্য। দ্বিতীয় তাকবীর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ পড়ার জন্য। তৃতীয় তাকবীর মাইয়েতের জন্য দুআ করার জন্য। চতুর্থ তাকবীর সালাম ফিরানোর জন্য।’ (মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাক হা.নং ৬৪৩৫)

২. হযরত ইবরাহীম নাখরী রহ. (মৃত:৯৬হি.)

عن حماد عن ابراهيم قال: سأله أيقراً على الميت اذا صلى عليه؟ قال: لا.

‘হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান বর্ণনা করেন, আমি ইবরাহীম নাখরীকে জিজ্ঞেস করলাম, জানাযার নামাযে কেরাআত পড়তে হবে কি না? তিনি বললেন, না পড়তে হবে না। (মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাক হা.নং ৬৪৩৩)

৩. হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রহ.(মৃত:৯৪হি.)

عن قتادة عن ابن المسيب قال: مانع في الصلاة على الميت من قراءة ولادعاء شيئاً معلوماً.

‘কতাদাহ রহ. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, জানাযার নামাযে কোনো নির্দিষ্ট কেরাআত কিংবা দুআর কথা আমার জানা নেই।’ (মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাক হা.নং ৬৪৩৬)

৪. হযরত মুহাম্মদ বিন সীরীন রহ.(মৃত:১১০হি.) এর আমল।

عن ايوب عن محمد انه كان لا يقرأ في الصلاة على الميت

‘বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আইয়ুব সাখতিয়ানী রহ. মুহাম্মদ বিন সীরীন সম্পর্কে বলেন, তিনি জানাযার নামাযে কোনো কেরাআত পড়তেন না।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং ১১৫২৩)

৫. হযরত আবুল আলিয়াহ রহ.(মৃত:৯৩হি.) এর ফাতওয়া।

عن ابي المنهال قال سألت اباالعالية عن القراءة في الصلاة على الجنابة بفاتحة الكتاب، فقال: ما كنت احسب ان فاتحة الكتاب تقرأ إلا في صلاة فيها ركوع و سجود.

‘আবুল মিনহাল বলেন, আমি আবুল আলিয়াকে জানাযায় সূরা ফাতেহা পড়তে হবে কিনা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমার মতে ফাতেহা এমন নামাযেই পড়তে হয়, যে নামাযে রুকু-সিজদাহ আছে।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং ১১৫২৪)

৬. হযরত আবু বুরদা রহ. (মৃত:১৪০-১৫০হি.) এর ফতওয়া।

عن سعيد بن ابي بردة عن ابيه قال: قال له رجل: اقرأ على الجنابة بفاتحة الكتاب؟ قال: لا تقرأ.

‘সাদ্দ ইবনে আবু বুরদা তার পিতা আবু বুরদাহ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, জৈনিক ব্যক্তি তার পিতা আবু বুরদাহকে জিজ্ঞেস করল, আমি কি জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ব? তিনি বললেন, না, তুমি পড়বে না।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং ১১৫২৬)

৭. নিজ যুগে মক্কাবাসীর ইমাম আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. (মৃত:১১৪হি.) এর ফাতওয়া।

عن حجاج قال سألت عطاء عن القراءة على الجنابة فقال: ما سمعنا بهذا الا حديثا.

‘হাজ্জাজ রহ. বর্ণনা করেন, আমি আতা ইবনে আবী রাবাহকে জানাযায় কেরাআত পড়তে হবে কিনা এব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, (পড়বে না) পড়ার কথা নতুন শুনছি।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং ১১৫২৮)

৮. হযরত তাউস বিন কাইসান (মৃত:১০৬হি.) রহ. এর আমল।

عن ابن طاوس عن ابيه و عطاء انهما كانا ينكران القراءة على الجنابة.

‘তাউস বিন কাইসান রহ. এর পুত্র তার সম্পর্কে এবং আতা রহ. এর সম্পর্কে বলেন, তাঁরা উভয়ে জানাযার নামাযে কেরাআত পড়তে অপছন্দ করতেন।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং ১১৫২৯)

৯. হযরত বকর বিন আব্দুল্লাহ রহ. (মৃত:১০৮হি.) এর বর্ণনা।

عن اسحاق ابن سويد عن بكر بن عبد الله قال: لا اعلم فيها قراءة.

‘ইসহাক বিন সুআইদ বকর বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জানাযায় কেরাআত পড়ার কোনো হুকুম আমার জানা নেই।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং ১১৫৩০)

১০. সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রহ. (মৃত:১০৬হি.) এর ফাতওয়া।

عن محمد بن عبد الله بن ابي سارة قال: سألت سالما فقلت: القراءة على الجنابة؟ فقال: لا قراءة على الجنابة.

‘মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আবী সারাহ বলেন, আমি সালেম রহ.কে জানাযায় কেরাআতের হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, জানাযায় কোনো কেরাআত পড়তে হয় না।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং ১১৫৩২)

উপরে মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার উদ্ধৃতিতে তাবেঈ ইমামগণের যে-সব উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে তার সব কয়টির সনদই জিয়াদ তথা গ্রহণযোগ্য। হাফেযে হাদীস ইবনে আব্দুল বার রহ. তাবেঈ ইমামগণ থেকে বর্ণিত এই সবকয়টি উক্তির সনদকে জিয়াদ বলেছেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন ‘আল-ইস্তিযকার ৩/৪২ তবআতু মক্কাতিল মুকাররমাহ’।

উল্লেখিত তাবেয়ীগণ ছাড়া আরো কয়েকজন তাবেঈ জানাযার নামাযে ফাতেহা পড়তে নিষেধ করেছেন। যেমন: হযরত সাঈদ ইবনে জুবারের (মৃত:৯৩হি.) হযরত মুজাহিদ ইবনে জাবর (মৃত:১০২হি.) হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান (মৃত:১২০হি.) সুফিয়ান ছাওরী (মৃত:১৬১হি.) প্রমুখ তাবেয়ীগণ। (উমদাতুল কারী ৬/১৯১ যাকারিয়া বুক ডিপো)

মদীনাবাসীর আমল: মদীনার বাসিন্দা ইমাম মালেক রহ. বলেন,

ليس ذالك. معمول به ببلدنا انما هو الدعاء, ادركت اهل بلدنا على ذالك. ‘আমাদের দেশে জানাযার নামাযে কেরাআত পড়ার উপর আমল নেই। জানাযায় শুধু দুআ পড়া হয়। আমি আমার দেশবাসীকে এর উপরই আমল করতে দেখেছি।’ (আল মুদাওওয়ানাতুল কুবরা ১/২৫১)

আহলে হাদীস বন্ধুদের অনুসৃত ব্যক্তিত্ব ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন,

جمهور السلف كانوا يكتفون بالدعاء ولا يقرعون الفاتحة .

‘অধিকাংশ সালাফ জানাযার নামাযে শুধু দুআ পড়তেন, সূরা ফাতেহা পড়তেন না।’ (ফয়যুল বারী ৩/৩০২ কুয়েতের ছাপা)

হাদীস, ফিকহে হানাফী, আছারে সাহাবা, আছারে তাবেয়ীন, মদীনাবাসীর আমল ও ইবনে তাইমিয়া রহ. এর উক্তির মাধ্যমে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ার বিধান নেই। অতএব যারা এ কথা বলে বেড়ায় যে, সূরা ফাতেহা পড়া ছাড়া জানাযার নামায হবে না, তাদের কথা ঠিক নয়। তবে হ্যাঁ, সূরা ফাতেহা পড়ার কথাও যেহেতু হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায় (যদিও ঐ হাদীসগুলো যথার্থ কারণে হানাফী মাযহাবে গ্রহণযোগ্য নয়) তাই কেউ যদি জানাযার নামাযে ছানা বা দুআর স্থানে ছানা বা দুআর নিয়তে সূরা ফাতেহা পড়ে তাহলে হানাফী মাযহাব মোতাবেক এতে কোনো সমস্যা নেই। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৪, বাহরুর রায়েক ২/৩১৫ এর টিকা) আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

মহিলাদের নামায পুরুষদের নামায থেকে ভিন্ন

পুরুষ-মহিলার মধ্যে আল্লাহ তাআলা মর্যাদাগত দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য করেননি। কিন্তু শারীরিক গঠন, অবয়ব ও শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে আল্লাহ তাআলা পুরুষ ও মহিলার মাঝে পার্থক্য করেছেন। ঠিক তেমনি ভাবে নর-নারীর সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণে শরীয়াতের বিভিন্ন হুকুম-আহমাক পালনের ক্ষেত্রেও নর-নারীর মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। আযান-ইকামাত, নামাযের ইমামতি, ইহরাম পরবর্তী সেলাইকৃত ও সেলাই বিহীন কাপড় পরিধানের ক্ষেত্রে পুরুষ মহিলার হুকুমের পার্থক্য একেবারেই স্পষ্ট। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানা থেকে আজ অবধি উম্মতের অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা দ্বারা এ কথা সুপ্রমাণিত যে, পুরুষ মহিলার নামাযের মধ্যে বিশেষ কিছু স্থানে পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য সবাই মেনে নিলেও আমাদের লা-মায়হাবী বন্ধুরা মানতে পারেনি। তাদের জন্যই আমাদের এই প্রয়াস।

ان المرأة عورة ‘মহিলা (মূল্যবান হওয়ায়) গোপন করে রাখার মত বস্তু’। (তাবরানী কাবীর:৯/২৯৫) যে জিনিস যত মূল্যবান হয় সে জিনিস তত গোপন করে রাখা হয়। ইসলাম মহিলা জাতিকে অতিমূল্যবান ও সম্মানিত বলে ঘোষণা করেছে। সেজন্য তাকে গোপনীয়তা রক্ষা করতে বলা হয়েছে। কারণ, মূল্যবান বস্তু যদি ঢেকে রাখা না হয়, গোপন করা না হয়, আবৃত করা না হয়, তাহলে তা লুট-ছিনতাই হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। মহিলা ‘গোপন বস্তু’ এই মূলনীতির আলোকেই মূলত শরীয়াতে বিভিন্ন হুকুম আহকামের ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।

সেই ধারাবাহিকতায় পুরুষ-মহিলার নামাযের মধ্যেও পার্থক্য করা হয়েছে। সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনগণ পার্থক্যের এ বিষয়টি খুব সহজভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্দেশিত মহিলাদের নামাযের পার্থক্য অকপটে মেনে নিয়েছেন। এমনকি ইমাম চতুষ্ঠয় এই পার্থক্যের ব্যাপারে একমত পোষণ করছেন। বাইহাকী রাহ. বিষয়টি সুনানে কুবরায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, নামাযের বিভিন্ন বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলার নামাযে পদ্ধতিগত ভিন্নতার প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো ‘সতর’ অর্থাৎ মহিলার জন্য শরীয়াতের হুকুম হলো: ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করা যা তাকে সর্বাধিক পর্দা দান করে। (সুনানে কুবরা বাইহাকী:২/২২৩ শামেলা)

মৌলিকভাবে মহিলার নামাযে পুরুষ থেকে চার ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে:-

১. তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানো।
২. হাত বাঁধার স্থান।
৩. রুকুতে সামান্য ঝুঁকা।
৪. সিজদা জড়সড় হয়ে করা।
৫. বৈঠকে পার্থক্য।

প্রথম পার্থক্য:- তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানো।

عن وائل بن حجر قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فساق الحديث. وفيه: يا وائل بن حجر اذا صليت فاجعل يديك حذاء اذنيك و المرأة تجعل يدها حذاء ثدييها. رواه الطبراني في الكبير ٢٥-٢٢/١٩٩: قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/٢٩٢: رواه الطبراني في حديث طويل في مناقب وائل من طريق مينة عن عمته ام يحيى بنت عبد الحبار, ولم اعرفها. وبقيته رجاله ثقات.

১. ‘ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলাম, তিনি আমাকে বললেন: হে ওয়ায়েল ইবনে হুজর যখন তুমি নামায পড়বে তখন তুমি তোমার হাত কান পর্যন্ত উঠাবে আর মহিলারা তাদের হাত বুকের উপর বাঁধবে।

হাইসামী রাহ. বলেন: ‘এই হাদীসের সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য উম্মে ইয়াহইয়া ব্যতীত’। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের নিকট উম্মে ইয়াহইয়াও প্রসিদ্ধ।

عن الزهري, قال: ترفع يديها حذو منكبيها. المصنف لابن أبي شيبة ١/٢٩٠:

২. ‘ইমাম যুহরী রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মহিলারা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে। (মুসাম্মাফে ইবেন আবী শাইবা: ১/২৭০)

দ্বিতীয় পার্থক্য:- হাত বাঁধা।

عن الطحاوي: المرأة تضع يديها على صدرها لان ذلك استر لها.

‘ইমাম তহাবী রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মহিলারা তাদের উভয় হাতকে বুকের উপর রেখে দিবে, আর এটাই তাদের জন্য যথোপযুক্ত সতর। (আসসিআয়া: ২/১৫৬, ফাতাওয়ায়ে শামী: ১/৫০৪, আল মাবসূত সারাখসী: ১/২৫)

তৃতীয় পার্থক্য: রুকুতে কম ঝুঁকা।

عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: قال تجمع المرأة اذا ركعت ترفع يديها الى بطنه, وتجمع ما استطاعت, فإذا يديها اليها, وتضم بطنها وصدرها الى فخذيهما, وتجمع ما استطاعت. مصنف عبد الرزاق: ص ٥٥٥

‘যখন মহিলা রুকুতে যাবে তখন হাতদ্বয় পেটের দিকে উঠিয়ে যথা সম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে, আর যখন সিজদা করবে তখন হাতদ্বয় শরীরের সাথে এবং পেট ও সীনাকে রানের সাথে মিলিয়ে দিবে এবং যথা সম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে।

চতুর্থ পার্থক্য:- সিজদা জড়সড় হয়ে করা।

عن يزيد بن أبي حبيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان, فقال اذا سجدتما فضعما بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست في ذلك كالرجل. كتاب المراسيل لابي داؤد برقم ٥٠٧:

‘বিখ্যাত তাবেঈ ইয়াযীদ ইবেন আবী হাবীব হলেন, একবার নবীজি নামাযরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদেরকে (সংশোধনের উদ্দেশ্যে) বললেন, যখন সিজদা করবে তখন শরীর যমীনের সাথে মিশিয়ে দিবে। কেননা মহিলারা এ ক্ষেত্রে পুরুষদের মত নয়’। (কিতাবুল মারাসীল ইমাম আবু দাউদ হা.নং ৮০)

আবু দাউদ রাহ. এর উক্ত হাদীস সম্পর্কে গায়রে মুকাল্লিদদের বিখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিস নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ‘আউনুল বারী’ ১/৫২০ এ লিখেছেন, এই মুরসাল হাদীসটি সকল ইমামের উসূল ও মূলনীতি অনুযায়ী দলীল হওয়ার যোগ্য।

عن مجاهد ابن جبر : انه كان يكره ان يضع الرجل بطنه على فخذه اذا سجد كما تضع المرأة. المصنف لابن ابى شيبة ٥/٣٥٣:

‘হযরত মুজাহিদ ইবনে জাবের রাহ. পুরুষদের জন্য মহিলাদের মত উরুর সাথে পেট লাগিয়ে সিজদা করাকে অপছন্দ করতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ১/৩০৩)

عن الحسن وقتادة قالوا: اذا سجدت المرأة فانها تنضم ما استطاعت ولا تتحافى لكى لا ترفع عجزيتها. المصنف لابن ابى شيبة ٥/٣٥٣:

‘হযরত হাসান বসরী ও কাতাদাহ রাহ. বলেন, মহিলা যখন সিজদা করবে তখন সে যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে। অঙ্গ-প্রতঙ্গ ফাঁকা রেখে সিজদা করবে না, যাতে কোমর উঁচু হয়ে না থাকে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ১/৩০৩)

পঞ্চম পার্থক্য:- বৈঠকের ক্ষেত্রে মহিলাগণ উভয় পা বাম পাশ দিয়ে বের করে দিয়ে যমীনের উপর নিতম্ব রেখে উরুর সাথে পেট মিলিয়ে রাখবে।

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جلست المرأة في الصلوة وضعت فخذهما على فخذهما الاخرى, واذا سجدت الصقت بطنها في فخذهما كاستر ما يكون لها. البيهقي في السنن الكبرى ٢/٢٢٣:

‘হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, নবীজি বলেছেন, মহিলা যখন নামাযের মধ্যে বসবে তখন যেন এক উরু (ডান উরু) আরেক উরুর উপর রাখে, আর যখন সিজদা করবে, তখন যেন পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে, যা তার সতরের জন্য অধিক উপযুক্ত হয়। (সুনানে কুবরা বাইহাকী: ২/২২৩)

عن خالد بن اللجلاج قال: كن النساء يؤمرن ان يتربعن اذا جلسن في الصلوة ولا يجلسن جلوس الرجال على اوراقهن، يتقى ذلك على المرأة مخافة ان يكون منها الشيء. المصنف لابن ابى شيبه ١/٣٥٣:

‘হযরত খালেদ ইবনে লাজলাজ রাহ. বলেন যে, মহিলাদেরকে আদেশ করা হত তারা যেন নামাযে দুই পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসে, পুরুষদের মত না বসে, আবরণীয় কোনো কিছু প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশংকায় মহিলাদেরকে এমনটি করতে হয়। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ১/৩০৩)

عن ابن عباس: تجتمع و تحتفز . المصنف لابن ابى شيبه ١/٣٥٢:

‘ইবনে আব্বাস রা. কে জিজ্ঞাস করা হলো যে, মহিলারা কীভাবে নামায আদায় করবে? তিনি বললেন, খুব জড়সড় হয়ে অঙ্গের সাথে অঙ্গ মিলিয়ে নামায আদায় করবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ১/৩০২)

উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা একটু মনোযোগের সাথে পাঠ করলে একজন ঠান্ডা মস্তিষ্কের পাঠক সহজে অনুমান করতে সক্ষম হবে যে, মহিলাদের নামাযের পার্থক্যের বিষয়টি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীদের যুগ থেকেই চলে আসছে এবং এর পক্ষে অনেক শক্তিশালী দলীল রয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু ইসলামী চিন্তাবিদ (?) সালাফ থেকে চলে আসা সুপ্রতিষ্ঠিত মত ও পথকে উপেক্ষা করে নিজের গবেষণালব্ধ মত পথকে জনগণের মাঝে চালিয়ে দেওয়ার ও জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তার কিছু নমুনা নিম্নে পেশ করা হলো:-

আরবের প্রসিদ্ধ গায়ের মুকাল্লিদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী তার ‘সিফাতুস সালাত’ নামাক গ্রন্থে দাবি করেন যে, পুরুষ-মহিলার নামাযের পদ্ধতি এক ও অভিন্ন এবং তিনি তার এ দাবি হাদীস বিরোধী নয় একথা প্রমাণ করার জন্য প্রথম পর্যায়ে তিনি আহলে হকের পক্ষের মহিলাদের নামাযের পার্থক্য সম্বলিত মারাসীলে আবুদাউদের হাদীসটিকে এ কথা বলে যয়ীফ আখ্যা দিলেন যে, ‘হাদীসটি মুরসাল, অতএব তা যয়ীফ’ অথচ অধিকাংশ ইমাম বিশেষ করে স্বর্ণযুগের ইমামদের মতে প্রয়োজনীয় শর্তবলী বিদ্যমান থাকলে মুরসাল হাদীসও মারফু এবং সহীহ হাদীসের মত গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। বিশেষ করে আবু দাউদ রহ. এর এই হাদীসটির শুদ্ধতার পক্ষে সমস্ত ইমামগণ এমনটি গাইরে মুকাল্লিদ আলেম সিদ্দীক হাসান খান সাহেবও স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।

তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বীয় মনগড়া উক্তিকে প্রমাণের জন্য ইবরাহীম নাখরী রাহ. এর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি নাকি বলেছেন ‘মহিলাগণ পুরুষদের মতই নামায আদায় করবে’ এই উক্তি উল্লেখ করে মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অথচ এই গ্রন্থের কোথাও এই কথাটি নেই। বরং ‘মাকতাবে শামেলার’ হাজার হাজার

কিতাব সার্চ করেও এই উক্তি খুজে পাওয়া যায়নি। দ্বীনের নামে এমন জালিয়াতির কোনো অর্থ হয় না।

তৃতীয় কাজটি এই করলেন যে, উম্মে দারদা রা. সম্পর্কে বর্ণিত একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন যে, ‘তিনি নামাযে পুরুষের ন্যায় বসতেন’ আলবানী সাহেব যদিও এই উক্তি দ্বারা নিজের দাবি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখজনকভাবে এই উক্তি দ্বারা পুরুষ-মহিলার নামাযের পার্থক্যের কথাই প্রমাণিত হয়। কেননা উভয়ের বসার পদ্ধতি এক হয়ে থাকলে ‘উম্মে দারদা পুরুষের মত বসতেন’ একথা বলার প্রয়োজন কি? যেহেতু উম্মে দারদা মহিলাদের নামাযে বসার প্রচলিত ও সাধারণ নিয়মের উল্টা করে পুরুষদের মত বসতেন, যা ছিল একটি ব্যতিক্রমী জিনিস। তাই একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং একথা বুখারী রাহ. এর ‘তারীখে সগীরে’ স্থান করে নিয়েছে।

এছাড়াও আহলে হাদীস ভাইয়েরা নিজেদের উদ্ভাবিত আরো কিছু যুক্তি-তর্ক পেশ করে থাকেন, যেগুলোর দুর্বলতা দ্বীনের বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান রাখেন এমন যে কেউ বুঝতে সক্ষম। তাই সেসব বিষয়ের অবতারণা করা হলো না।

আহলে হাদীস ভাইগণ পুরুষ-মহিলাদের অনেক ইবাদাতে পার্থক্য মানেন, যেগুলোর ভিত্তি মহিলাদের সতর ঢাকার উপর। যেমন ইহরাম অবস্থায় পুরুষের জন্য মাথা ঢাকা নিষেধ অথচ মহিলাদের জন্য মাথা ঢেকে রাখা ফরয। অনুরূপভাবে পুরুষগণ উচ্চ আওয়াজে তালবিয়া পাঠ করে থাকেন অথচ মহিলাদের জন্য নিম্নস্বরে তালবিয়া পড়া জরুরী, আযান-ইকামাত পুরুষদের জন্য খাস হওয়া; মহিলাদের জন্য এর হুকুম না থাকা। এ ছাড়া আরো অনেক ইবাদাতে পুরুষ-মহিলার পার্থক্য সবাই মেনে আসছে। তাহলে নামাযের ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলার পার্থক্য মানতে তাদের সমস্যা কোথায়? এই পার্থক্য তো আমাদের মনগড়া কোনো বিষয় নয়। সরাসরি হাদীস ও আসারে সাহাবা থেকে প্রমাণিত। আহলে হাদীস বন্ধুরা একদিকে হাদীস মানার দাবি করছে আবার অন্যদিকে হাদীসের উল্টা কাজ করছে - কি আজব বৈপরিত্য?

মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানো যাদের লক্ষ্য এবং মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যাদের উদ্দেশ্য, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাদের থেকে দূরে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পুরুষদের জামা‘আতে মহিলাদের অংশ গ্রহণ ! শরীয়ত কী বলে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বর্ণনায় মহিলাদের নামাযের উত্তম স্থান ক. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মহিলার জন্য নির্ধারিত হজরায় নামায

অপেক্ষা তার ঘরে নামায পড়া উত্তম, আর ঘরে নামায অপেক্ষা নিভৃত ও একান্তকোঠায় নামায পড়া উত্তম। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৫৭০)

খ. একদা হযরত উম্মে হুমাঈদ রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার সঙ্গে নামায পড়তে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি জানি তুমি আমার সঙ্গে নামায পড়তে ভালবাস, কিন্তু তোমার ঘরে নামায তোমার বাইরের হুজরায় নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার হুজরায় নামায তোমার বাড়ীতে নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার বাড়ীতে নামায তোমার মহল্লার মসজিদে নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার মহল্লার মসজিদে নামায আমার মসজিদে নামায অপেক্ষা উত্তম। তারপর সে নিজ ঘরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নামাযের স্থান নির্ধারণ করিয়ে নিলেন এবং আমরণ তাতেই নামায আদায় করলেন। (মুসনাদে আহমাদ, সহীহ ইবনে খুযাইমা ও সহীহ ইবনে হিব্বান, সূত্র “তারগীব-তারহীব” হাদীস নং ৫১৩)

গ. হযরত উম্মে সালামা রা.এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, গৃহাভ্যন্তরই হল মহিলাদের জন্য উত্তম মসজিদ। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৬৫৯৮)

উপর্যুক্ত সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়:

ক. মহিলাদের নামাযের জন্য তাদের নিজ গৃহকোণ মসজিদ অপেক্ষা উত্তম।

খ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই মহিলাদেরকে মসজিদে গমন থেকে নিরুৎসাহী করেছেন।

গ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পন্থাকে উত্তম বলেছেন তার বিপরীতটা উত্তম ও সওয়াবের কাজ হতেই পারে না।

বি. দ্র. হাদীসের কয়েকটি বর্ণনা যা মহিলাদের মসজিদে আসা প্রসঙ্গে পাওয়া যায় তা প্রাথমিক যুগের কথা, তখন পুরুষরাও সকল মাসআলা জানত না, তখন কয়েকটি কঠিন শর্ত সহকারে রাতের আধারে নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে একদম পিছনের কাতারে দাড়ানোর অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে নবীজি উক্ত অনুমতি প্রত্যাহার করে তাদেরকে ঘরে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সুতরাং ঐ সকল হাদীস দ্বারা বর্তমানে মহিলাদের মসজিদে গমন জায়েয বলা যাবে না।

মহিলাদের মসজিদে গমন প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহাবীদের উক্তি

ক. সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারিণী ও উম্মতের শ্রেষ্ঠ নারী আলেম আম্মাজান হযরত আয়িশা রা. বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতেন যে, মহিলারা (সাজ-সজ্জা গ্রহণে, সুগন্ধি ব্যবহারে ও সুন্দর পোষাক পরিধানে) (মুসলিম

শরীফের টীকা দ্রষ্টব্য)) কী পন্থা উদ্ভাবন করেছে তাহলে অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করে দিতেন, যেমন নিষেধ করা হয়ছিল বনী ইসরাঈলের মহিলাদেরকে। (সহীহ বুখারী হাদীস নং ৮৬৯, সহীহ মুসলিম শরীফ হাদীস নং ৪৪৫)

খ. হযরত আমর শাইবানী রহ. বলেন, আমি (এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকাহবিদ) সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কে দেখেছি যে, তিনি জুম‘আর দিনে মহিলাদেরকে মসজিদ হতে বের করে দিতেন এবং বলতেন, তোমরা নিজ ঘরে চলে যাও, তোমাদের জন্য উহাই উত্তম। হাদীসটি ইমাম তাবারানী নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন। (“তারগীব-তারহীব” হাদীস নং ৫২৩)

উল্লেখ্য যে, এ হলো নবীযুগের পর-পরই মসজিদে গমনকারিণী মহিলাদের অবস্থার পরিবর্তনে হযরত আয়িশা রা. এর উক্তি ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর আমল। যদিও তখনকার মহিলারা ছিলেন সাহাবী অথবা তাবেঈ, অন্য কেউ নন। পক্ষান্তরে আজ চৌদ্দ শতাব্দি পরে যখন মহিলাদের তেল, সাবান, শেম্পুসহ সকল প্রকার প্রসাধনী-ই সুগন্ধিযুক্ত। অধিকাংশ মহিলারা পর্দা করে না। যারা বোরকা পরে তাদের অধিকাংশই সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল চেহারাকে উন্মুক্ত রাখে এবং তাদের বোরকা ও পোশাক হয় নজরকাড়া ফ্যাশনের। এববস্থা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলে মহিলাদেরকে মসজিদে গমনের অনুমতি দিতেন এটা বিবেকবান কেউ কি কল্পনা করতে পারে?

মহিলাদের মসজিদে গমনের ব্যাপারে হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের সিদ্ধান্ত:

ক. হানাফী মাযহাব: সকল মহিলাদের জন্য জামা‘আত, জুম‘আ, ঈদ ও পুরুষদের মাহফিলে অংশগ্রহণ সর্বাবস্থায় মাকরুহে তাহরীমী। (আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুল: খণ্ড-২, পৃঃ ১১৭২)

খ. মালেকী মাযহাব: অতিবৃদ্ধা মহিলা ছাড়া সকল মহিলার জন্যে জুম‘আয় অংশ গ্রহণ হারাম।

গ. শাফেঈ মাযহাব: অতিবৃদ্ধা মহিলা ছাড়া সকল মহিলার জন্য জুমআসহ যে কোন জামাআতে অংশ গ্রহণ সর্বাবস্থায় মাকরুহে তাহরীমী। (আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা‘আ: খণ্ড-১, পৃঃ ৩১১-১২)

প্রিয় পাঠক ! উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা যা পেলাম এর বিপরীতে এমন কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস ও ফিকহী বর্ণনা নেই যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো যুগে মহিলাদের মসজিদে গমন ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব কিংবা অধিক সওয়াবের কাজ ছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবীগণ ও পরবর্তী ফিকাহবিদ ইমামগণ মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে উৎসাহিত করেছেন। তাহলে

বর্তমানে নৈতিক অবক্ষয়ের চরম মুহূর্তে কী করে তা সাওয়াব ও আগ্রহের কাজ হতে পারে? যে সকল আলেম বা স্কলারগণ বর্তমানে মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে উৎসাহিত করেন, তাঁরা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আয়িশা ও ইবনে মাসউদ রা. এবং মুজতাহিদ ইমামগণের চেয়েও বেশী যোগ্য ও অনুসরণীয় হয়ে গেলেন? যে সকল স্কলার অসংখ্য বেগানা মহিলাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ইসলামী লেকচার প্রদান করেন। কিংবা লক্ষ লক্ষ বেগানা মহিলাদের দেখার জন্য বিনা প্রয়োজনে নিজেদের উপস্থাপন করেন। অথচ সহীহ হাদীসের আলোকে এ সবই নিষিদ্ধ। (দেখুন: সুনানে তিরমিযী হাদীস নং ২৭৮২, সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং ৪১১২) বাস্তব দ্বীন ও ইসলামের ক্ষেত্রে এরাও কি গ্রহণযোগ্য হয়ে গেলেন ?

মাসআলা ক. একই নামাযে জামা‘আতে নামায পড়ার ক্ষেত্রে যে সকল পুরুষের সম্মুখে কিংবা পাশে কোন মহিলা থাকবে সে সকল পুরুষের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী: ১ম খণ্ড, পৃ.৫৭৩, আলমগীরী: ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭)

একারণেই হারাম শরীফে পুরুষদের সম্মুখে ও পাশে দাঁড়ানো থেকে মহিলাদেরকে নিবৃত্ত করতে কর্তৃপক্ষ সর্বশক্তি নিয়োগ করে থাকে।

মাসআলা খ. মসজিদের যে তলায় মহিলারা জামা‘আতে অংশগ্রহণ করে তার উপর তলায় বরাবর স্থানের পিছনে যে সকল পুরুষ দাঁড়াবে তাদের সকলের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে শামীসহ দূররে মুখতার: ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৪ , ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭)

উল্লেখ্য যে, টার্মিনাল, জংশন, এয়ারপোর্ট ও মুসাফিরদের যাত্রা বিরতির স্থানসমূহে, অনুরূপ হাসপাতাল ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় স্থানে মহিলাদের নামায আদায়ের ব্যবস্থা রাখা জরুরী। এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপট। হারামাইন শরীফাইন ও মক্কা-মদীনার পথে মহিলাদের নামাযের ব্যবস্থা মূলত এ প্রেক্ষিতেই। যেন তাওয়াফ-সাদ্বির জন্য আগমনকারিণী, যিয়ারত ইত্যাদির জন্য বাইরে গমনকারিণীরা ও ভ্রমণরত মহিলারা সময় হলে নামায পড়ে নিতে পারে। এসকল স্থানে স্থানীয় আরব মহিলাদেরকে সাধারণত দেখা যায় না, তারা নিজেদের ঘরেই নামায পড়ে নেয়। আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা হারামাইন শরীফাইনে আগাম্ভক শরীয়তের হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞ মহিলাদের জামা‘আতে হাজির হওয়া দেখে এসে নিজেদের আবাসিক এলাকার মসজিদে মহিলাদের ব্যবস্থা রাখার দাবি তোলে। অথচ সকল বালগ পুরুষদের জন্য যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা‘আতে শরীক হয়ে পড়া ওয়াজিব, এর জন্যও যে কিছু করণীয় আছে তা চিন্তাও করে না। বিষয়টি এক প্রকার গোমরাহী যা গভীরভাবে ভাবা উচিত। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে সকল প্রকার গোমরাহী থেকে হিফাজত করুন। আমীন।

ওয়াসীলা দিয়ে দু‘আ করার শরঈ বিধান

ইসলামের যে সকল বিষয় সূত্র পরম্পরায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং উম্মতের একটি অংশ প্রত্যেক যুগে অবিচ্ছিন্নভাবে আমলের ধারা চালু রেখেছে, তার একটি হল দুআতে ওয়াসীলা ধরা, মাধ্যম গ্রহণ করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা। বিষয়টি কুরআন, হাদীস এবং সাহাবাদের আমল দ্বারা প্রমাণিত। হ্যাঁ মালিকী, হাম্বলী, শাফেঈ এমনকি মুতাআখখিরীন হানাফিয়াহও শরীয়তের দৃষ্টিতে তাওয়াস্সুল বা ওয়াসীলা ধরাকে বৈধ বলেছেন। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ওয়াসীলা গ্রহণকারীর প্রশংসা করেছেন। (দেখুন-সূরা ইসরা আয়াত-৫৭)

নিম্নে আলোচ্য বিষয়ের দলীলভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো:

আভিধানিক অর্থে তাওয়াস্সুল বা ওয়াসীলা:

তাওয়াস্সুল অর্থ: তাকররু'ব বা নৈকট্য লাভ, বলা হয় অমুক ব্যক্তি আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে।

কারো মাধ্যমে দুআ করানোকেও তাওয়াস্সুল বা ওয়াসীলা বলে।

সূরা মায়দার ৩৫নং আয়াতে ওয়াসীলা শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। (সূত্র: তাফসীরুল আলুসী-৬/১২৪)

পরিভাষায়:

আল্লাহর গুণবাচক নাম বা কোন নেক আমল কিংবা আল্লাহর কোনো নেক বান্দাকে দুআর মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম বানানো অর্থাৎ: এভাবে দুআ করা যে, আয় আল্লাহ ! অমুক নেক আমল বা অমুক বান্দার ওয়াসীলায় আমার দুআ কবুল করুন। (সূত্র: তুহফাতুল কারী ৩/৩৩৭)

দুআর মধ্যে মাধ্যম/ওয়াসীলা ধরার মৌলিকভাবে চারটি পদ্ধতি পাওয়া যায়।

১. التوسل باسماء الله تعالى و صفاته ১.

‘আল্লাহর নাম ও গুণবাচক নামের দ্বারা ওয়াসীলা ধরা। অর্থাৎ: এভাবে দুআ করা যে, اسألك بكل اسم سميت به نفسك সমস্ত ফুকাহা এ পদ্ধতিটিকে জায়েয বলেছেন। ‘আল্লাহ তাআলা বলেন: ‘আল্লাহ তাআলার অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলাকে ডাকো (প্রার্থনা করো)।’ (সূরা আ-রাফ- ১৮০ আরও দেখুন: মুসনাদে আহমাদ ১/১৯৩)

২. التوسل بالإيمان والأعمال الصالحة ২.

দুআর মধ্যে ঈমান ও নেক আমলের ওয়াসীলা ধরা। অর্থাৎ: এভাবে দুআ করা: আমার অমুক নেক আমলের ওয়াসীলায় আমার দুআ কবুল করো। তাওয়াস্সুলের এ পদ্ধতি জায়েয হওয়ার ব্যাপারেও সমস্ত উলামা, ফুকাহা ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

কোন কোন মুফাসসিরীনের মতে কুরআনের সূরা মায়েদা-৩৫, সূরা ইসরা-৫৭ নং আয়াতে ব্যবহৃত ওয়াসীলা শব্দটি উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তিন ব্যক্তির পাহাড়ের গর্ভে আটকে পড়ার ঘটনা সম্বলিত হাদীসটিও নেক আমলের মাধ্যমে ওয়াসীলা ধরার দলীল। বুখারীতে ইবনে উমর রা. থেকে হাদীসটি পাঁচ জায়গায় বর্ণিত হয়েছে- হাদীস নং ২২১৫, ২২৭২, ২৩৩৩, ২৪৬৫, ৫৯৭৪, মুসলিম-২৭৪৩

৩. التوسل بالنبي أو الصالحاء في الحياة الدنيا.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওয়াসীলা ধরা বা আল্লাহর নেক বান্দাদের জীবদ্দশায় তাদের ওয়াসীলা ধরা।

অর্থ: ‘তাদের মাধ্যমে দুআ করানো বা তাদের ওয়াসীলায় দুআ করা’ উভয় সূরতই বৈধ হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতবিরোধ নেই।

তাওয়াসসুলের এ পদ্ধতি তাওয়াতুর বা ‘প্রত্যেক নির্ভরযোগ্যসূত্রে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত’ দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

তদ্রূপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান ও মুহাব্বত এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি মুহাব্বতের ওয়াসীলা ধরে দুআ করাও উলামায়ে কেরামের নিকট জায়েয। অর্থাৎ এভাবে দুআ করা: أسألك بنبيك محمد আর উদ্দেশ্য নেওয়া أسألك بإيماني به وبمحبه

এ ক্ষেত্রে সলফের কোন মতভেদ খুঁজে পাওয়া যায় না। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ.ও এ পদ্ধতিকে বৈধ বলেছেন। দলীলের জন্য (দেখুন-সূরা নিসা-৬৪, তিরমিযী-৩৫৭৮, বুখারী শরীফ-১০১০)

৪. التوسل بالنبي والصالحاء بذاتهم بعد وفاتهم

ইত্তিকালের পর নবী আ. অথবা নেকবান্দাদের সত্ত্বার ওয়াসীলা গ্রহণ করা। অর্থাৎ এভাবে দুআ করা যে,

اللهم إني أسألك بنبيك أو بجاه نبيك أو بحق نبيك .

এবং তাদের সত্ত্বার ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করা। তাওয়াসসুলের এ পদ্ধতির ব্যাপারে অধিকাংশ ফুকাহা অর্থাৎ: মালিকী, শাফেঈ, হাম্বলী এবং মুতাআখখিরীনে হানাফিয়াহগণের অভিমত হল এভাবে তাওয়াসসুল জায়েয যেভাবে জীবিত অবস্থায়ও জায়েয। (সূত্র: শরহুল মাওয়াহিব-১২/১৯৪, আল মাজমু’-৮/২৭৪, আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়া-১/২৬৬, ফাতহুল কাদীর-৮/৪৯৮, ইবনে আবিদীন-৬/৩৯৭)

শেষোক্ত তাওয়াসসুলের ব্যাপারে যেহেতু সালাফী ও আহলে হাদীস ভাইয়েরা মতভেদ করে থাকে, তাই বিষয়টি সামান্য বিশ্লেষণের সাথে তুলে ধরা হল:-

জমহুরে উলামায়ে কেরাম যে সকল যুক্তির ভিত্তিতে এটাকে জায়েয বলেন:

... يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ٥.

‘হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর পর্যন্ত পৌঁছার জন্য ওয়াসীলা সন্ধান কর’। (সূরা মায়িদা:৩৫)

বর্ণিত আয়াতে ওয়াসীলা দ্বারা التوسل অর্থাৎ সত্ত্বা এবং আমল উভয়টার ওয়াসীলা উদ্দেশ্য, কারণ “ওয়াসীলা” অর্থগতভাবে উভয়টাকে ধারণ করে। ফাতহুল বারীর বর্ণনা দ্বারাও এ কথা স্পষ্ট বুঝে আসে যে, وسيلة শব্দটি সত্ত্বার মাধ্যমে ওয়াসীলা ধরে দুআ করাও বুঝায়।

আল্লামা ইবনে হাজার রহ. বুখারীর ১০১নং হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, অন্য বর্ণনাতে লাফ্ফিনা فتنسينا إليك ننتوسل (হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওয়াসীলা ধরে দুআ করতাম। আপনি বৃষ্টি বর্ষণ করতেন...) এর সাথে إلى الله وسيلة (এ অংশও আছে। অর্থাৎ আক্বাস রা. কে তোমরা আল্লাহর নৈকট্যের ওয়াসীলা বা মাধ্যম বানাও। সুতরাং উক্ত হাদীসের প্রথম অংশে وسيلة দুআ চাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হলেও وسيلة اتخذوه অংশে সত্ত্বার ওয়াসীলা গ্রহণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মধ্যেও ওয়াসীলা শব্দটি উভয় অর্থকে শামিল করেছে, যা বর্ণিত ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। (সূত্র: ফাতহুল বারী- ৬/১১)

وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ٢.

‘যদিও পূর্বে এরা কাফেরদের (অর্থাৎ পৌত্তলিকদের) বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলার কাছে বিজয় প্রার্থনা করত’ (সূরা বাক্বারা: ৮৯)

এ আয়াতের তাফসীরে উলামায়ে কেরাম লিখেছেন: ইয়াহুদীদের যখন কোনো বিষয় কঠিন হয়ে দাঁড়াতো তারা দুআ করত:

اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذى نجد صفاته في التوراة.

অর্থাৎ হে আল্লাহ ! শেষ যমানায় প্রেরিতব্য নবীর ওয়াসীলায় আমাদেরকে সাহায্য কর, যার গুণাবলী আমরা তাওরাতে পেয়েছি। সুতরাং তাদের দুআ কবুল করা হতো। এখানে স্পষ্টভাবেই বুঝা যাচ্ছে: নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আসার পূর্বেই তার ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করা হতো এবং তা কবুল করা হতো।

কুরআনে তাদের এ কর্মের সমালোচনা ছাড়াই বলা হয়েছে সুতরাং এ আয়াত তাওয়াসসুলের স্পষ্ট দলীল বলা ছাড়া গতান্তর নেই।

৩. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ففسقينا الخ (বুখারী শরীফ-হা.নং ১০১০)

আরবী ব্যাকরণিক দিক থেকে كُنَّا শব্দটি একটি চলমান কাজকে বুঝায়। সুতরাং এ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, উমর রা. বলেন: হে আল্লাহ! আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করতাম আপনি কবুল করতেন.....

অতএব, আরবী ব্যাকরণিক দিক থেকে হাদীসটি এ অর্থ বুঝাচ্ছে যে, সাহাবায়ে কেরাম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইত্তিকালের পর তাঁর ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করতেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর খলীফা ছিলেন আবু বকর রা. তারপর উমর রা., উমর রা. এর খেলাফত পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করা হত, হাদীসটি এ কথাই বুঝাচ্ছে, সুতরাং ‘ওয়াসীলা ধরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশার সাথে সীমিত’ এমন কোন কথা বর্ণিত হাদীসটিতে নেই। তবে আহলে হাদীস বন্ধুরা দাবী করে থাকে যে, “উক্ত হাদীসে আব্বাস রা. এর ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করা হয়েছে, কারণ তিনি জীবিত ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করা হয়নি, যেহেতু তাঁর ইত্তিকাল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টি দিলে স্পষ্ট বুঝে আসবে যে, উক্ত বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করা হয়েছে। দুআর শব্দটি ছিল: اللهم إنا نتوسل بعم نبينا الخ

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আমরা আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার ওয়াসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি, হাদীসের শব্দটি এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ‘ক্বারাবাত’ বা আত্মীয়তা সম্পর্কের ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করা বুঝাচ্ছে, দুআর মধ্যে এ কথা বলা হয়নি যে, আব্বাস রা. এর ওয়াসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি বরং বলা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচার ওয়াসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়তা সম্পর্কের ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করার অর্থই হল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করা। সুতরাং এখানে তাঁর মৃত্যুর পর ওয়াসীলা দেওয়া নিষেধ এমন কোন প্রমাণ নেই, বরং এটা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট হাদীস সামনে পেশ করা হল:

حديث مالك الدار: أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب رض ، ف جاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله! استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا... الخ

أخرجه البيهقي و بطريقه أخرجه التقى السبكي في شفاء السقاح وأخرجه البخاري في تاريخه بطريق أبي صالح ذكوان، وأخرجه ابن خيثمة، أخرجه أيضا ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما نص عليه ابن حجر

‘মালেক আদদার রা. থেকে বর্ণিত, উমর বিন খাতাব রা. এর খেলাফতকালে বৃষ্টিখরার শিকার হয়েছিল। এক ব্যক্তি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবরের নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তাআলার কাছে উম্মতের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা করুন তারাতো বৃষ্টিখরায় ধবংস হয়ে যাচ্ছে...।’ (ফাতহুল বারী:২/৬১১)

হাদীস বিশারদদের ইমাম ইবনে হাজার রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে তাঁর ইন্তেকালের পর বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রার্থনাকারী ছিল বিলাল বিন হারেস, কোনো সাহাবী থেকে এর বিরোধিতার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

সুতরাং তাওয়াসসুলের এ পদ্ধতিকে অস্বীকার করা কুরআন-হাদীস অস্বীকার করার নামান্তর।

৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের তাওয়াসসুলের শিক্ষা দিয়েছেন।

এরপর সাহাবায়ে কেলাম তার পরবর্তীদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের পর তাঁর তাওয়াসসুল গ্রহণের শিক্ষা দিয়েছেন।

عن عثمان بن حنيف: أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ادع الله أن يعافنيفأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعوا بهذا الدعاء: اللهم إني أسئلك و اتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي.....أخرجه الترمذى ٣٥٩٢-وقال: هذا حديث حسن غريب.

أخرجه البخارى فى تاريخه الكبير و ابن فى صلاة الحاجة والنسائى فى عمل اليوم والليلة، وأبو نعيم فى معرفة الصحابة والبيهقى فى دلائل النبوة و غيرهم على اختلاف يسير فى غير موضوع الاستشهاد، وصححه جماعة من الحفاظ يقارب عددهم خمسة عشر حافظا فمنهم سوى المتأخرين الترمذى وابن حبان والحاكم والطبرى وابونعيم والبيهقى والمنذرى.

‘উসমান বিন হুнайফ রা. থেকে বর্ণিত, চক্ষুরোগে আক্রান্ত এক ব্যক্তি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, আমার সুস্থতার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করুন... সুতরাং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সুন্দরভাবে উযু করতে বললেন এবং এই দুআটি পড়তে বললেন- হে আল্লাহ ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এবং রহমতের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওয়াসীলায় আপনার প্রতি ধাবিত হচ্ছি...(তিরমিযী হা.নং ৩৫৭৮)

বর্ণিত হাদীসে অনুপস্থিতির সম্বোধন/গায়েবানা সম্বোধনের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সত্ত্বার ওয়াসীলা দিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম স্বয়ং দুআ করা শিক্ষা দিয়েছেন, যা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশার সাথে খাস না হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

বরং হাদীসের বর্ণনাকারী উসমান বিন হানীফও উক্ত হাদীসের এই অর্থই বুঝেছেন যে, ওসীলা ধরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশার সাথে খাস নয়। তাঁর ইন্তেকালের পরও তাঁর সত্তার ওয়াসীলা গ্রহণ করা যাবে। তাবারানী শরীফে আছে,

ان رجلا كان يختلف الى عثمان بن عفان رضى الله عنه في زمن خلافته, فكان لا يلتفت ولا ينظر اليه في حاجته فشكا ذلك لعثمان بن حنيف, فقال له: ائت الميضاة فتوضأ... ثم قل: اللهم اني أسألك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة, يا محمد اني اتوجه بك الى الله فيقضى لي حاجتي.... فقال ابن حنيف, والله ما كلمته ولكن ما شهدت رسول الله الخ

اخرجه الطبراني في معجم الصغير, ٥/١٥٣: والبيهقي من طريقين واسنادهما صحيح, والهيشمي في مجمع الزوائد واقره عليه كما اقر المنذرى قبله في الترغيب.

‘উসমা বিন আফফান রা. এর খেলাফাত যুগে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে একটি প্রয়োজনে বার বার যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি কোনো কারণ বশত: তার দিকে দ্রুক্ষেপ করছিলেন না এবং তার প্রয়োজনও পূরা করছিলেন না। তাই সে উসমান বিন হুনাইফ এর কাছে শেকায়াত করল। উসমান বিন হুনাইফ তাকে বললেন, ভালোভাবে উযু কর... অত:পর এই বলে দুআ কর- হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এবং রহমতের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওয়াসীলায় আপনার দিকে ধাবিত হচ্ছি...(তবারানী সগীর:১/১৮৩)

প্রসিদ্ধ ও বিদগ্ধ আহলে হাদীস আলেম আল্লামা মুবারাকপুরী লিখেছেন: শায়েখ আব্দুল গনি ‘ইনজাহুল হাজাহ’ কিতাবে শায়েখ আবেদ সিন্ধির সূত্রে লিখেছেন যে, হাদীসুল আ‘মা (অর্থাৎ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিখানো ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করার হাদীসটি) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সত্তার মাধ্যমে তাওয়াসসুল জায়েয হওয়া বুঝায় এবং উসমান বিন হানীফের তালীমের হাদীসটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পর তাঁর সত্তার তাওয়াসসুল জায়েয হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে।

আল্লামা শাওকানী তুহফাতুয যাকেরীনে বলেছেন, উসমান বিন হানীফের তা‘লীমের হাদীসটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সত্তার মাধ্যমে তাওয়াসসুল জায়েয হওয়ার উপর দলীল। শর্ত হলো এ বিশ্বাস রেখে দুআ করতে হবে যে, করনেওয়ালা যাত আল্লাহ তাআলা। (তুহফাতুল আহওয়াযী:১০/২৭)

৬. স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করেছেন। যারা দুনিয়া থেকে অনেক পূর্বেই ইন্তেকাল করে গেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

اغفر لأمى فاطمة بنت اسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلى فإنك ارحم الراحمين. اخرجه الطبرانى فى الكبير والوسط كما فى مجمع الزوائد للهيثمى ٢/٥٩:

‘আমার মা ফাতেমা বিনতে আসাদের মাগফেরাত কর এবং আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আমার পূর্বে গত নবীগণের ওয়াসীলায় তার কবরকে প্রশস্ত করেদিন... (মাজমাউযযাওয়ায়েদ:৯/২৫৭)

৭. নবী আ. ও আশ্বিয়া আ. এর ইন্তেকালের পর তাদের ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করার বিষয়টি পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখন আমরা পাঠক সমাজের সামনে অন্যান্যদের ওয়াসীলায় দুআ করার একটি দলীল পেশ করছি।

وفى سنن ابن ماجه فى باب المشى إلى الصلاة عن إلى سعيد الخدرى رضى الله عنه: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال إني أسألك بحق السائلين عليك....

قال الشيخ زاهد الكوثرى: لا تنزل درجة الحديث مهما نزلت عن درجة الاحتجاج به بل يدور أمره بين الصحة والحسن لكثرة المتابعات والشوهد كما أشرنا إليهم وقد حسن هذا الحديث الحفاظ العراقي فى تخريج الأحياء وابن حجر فى أمالى الأذكار.

‘যে ব্যক্তি নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হয় অতঃপর বলে- আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনার কাছে প্রার্থনাকারীদের ওয়াসীলায়...’

বর্ণিত হাদীসটি সাধারণ এবং বিশেষ সব ধরনের লোকের ওয়াসীলা গ্রহণের বৈধতার প্রমাণ বহন করে।

বি. দ্র. ইবনে তাইমিয়া রাহ. মাজমুআতুল ফাতাওয়াতে তিন ধরনের তাওয়াসসুলের আলোচনা করেছেন।

১. التوسل بالإيمان به وبطاعته

‘নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ঈমান এবং তাঁর আনুগত্যের ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করা’

২. التوسل بمعنى دعائه وشفاعته صلى الله عليه وسلم

‘তাওয়াসসুল অর্থাৎ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে দুআ এবং শাফায়াত প্রার্থনা করা’ । ইবনে তাইমিয়া রাহ. এই দুই প্রকারের ব্যাপারে বলেছেন, উলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে এ উভয় প্রকার জায়েয।

التوسل به بمعنى الاقسام على الله بذاته صلى الله عليه وسلم ٩

‘তাওয়াসসুল অর্থাৎ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সত্ত্বার কসম দিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করা’ (মাজমুআতুল ফাতাওয়া:১/১০৬)

বিংশ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেছেন, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. যে তাওয়াসসুলকে নাজায়েয বলেছেন সেটা হলো: التوسل بمعنى الاقسام على الله بغير أسمائه

‘তাওয়াসসুল অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো নামে কসম দিয়ে দুআ করা’। আর এ প্রকারের তাওয়াসসুলকে আমরাও নাজায়েয বলি।

কিন্তু তাওয়াসসুল যদি উক্ত পদ্ধতিতে না হয় তাহলে সেটা জায়েয হবে। (ফায়যুল বারী:৩/১০৫)

উল্লেখ্য, কেউ যদি এ বিশ্বাস নিয়ে দুআ করে যে, ‘আমার মত গুনাহগারের আল্লাহর কাছে সারাসরি চাওয়ার যোগ্যতা কোথায়, তাই আমরা আল্লাহর নেক বান্দাদের কাছে চাই’ (মাজারপুজারী, বিদআতী সম্প্রদায় যেটা করে থাকে) তাওয়াসসুলের এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ হারাম।

তদ্রূপ কোনো বুয়ুর্গের কবরে যেয়ে তার কাছে অনুরোধ করা যে, ‘সে যেন তার জন্য আল্লাহর কাছে তার কোনো প্রয়োজন পূরণের দুআ করে’ তাওয়াসসুলের এ পদ্ধতিটিও নাজায়েয। (ইখতিলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম:পৃ.৪৯-৬০)

আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন- ফাতহুল বারী:২/৬১০, তুহফাতুল কারী:৩/৩৩৭-৩৩৯, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম:৫/৩১৬-৩১৯, ফয়যুল বারী:৩/১০৫, তুহফাতুল আহওয়াযী:১০/২৫-৩১, মাকালাতুল কাওসারী:৩৩৯-৩৫৬, মাওসুআতুল ফিকহিয়াহ:১৪/১৪৯-১৬৪)

এক মজলিসে বা এক শব্দে তিন তালাকের শরয়ী বিধান

কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে এক মজলিসে বা এক শব্দে তিন তালাক দেয় তাহলে কয় তালাক হবে, এ ব্যাপারে তিনটি মাযহাব প্রসিদ্ধ আছে।

১. শিয়াদের শাখা জা‘ফরীদের মাযহাব হলো এর দ্বারা কোনো তালাক হবে না। যেহেতু সালাফে সালাহীদের কারো থেকে এ ধরনের উক্তি বর্ণিত হয়নি, তাই এই মাযহাব বাতিল। এ নিয়ে কোন আলোচনার প্রয়োজন নেই। (তাকমিলাহ ১/১১১, ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়াহ ১৭/৯)

২. কোন কোন আহলে জাহের এবং ইবনে তাইমিয়াহ রহ. ও ইবনুল কাইয়িম রহ. এর মাযহাব হলো এর দ্বারা এক তালাক হবে, যদিও তিন তালাকের নিয়ত করে থাকে। (তাকমিলাহ ১/১১৫)

৩. সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত উমর, আলী,উসমান, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর, ইবনে আমর,উবাদাহ বিন সামিত, আবু হুরাইরা,ইবনে আব্বাস,ইবনে যুবায়ের , আসেম বিন উমর ও হযরত আয়িশা রা. সহ আরও অনেক সাহাবী এবং ইমাম আবু হানীফা,ইমাম মালেক,ইমাম শাফেয়ী,ইমাম আহমাদ,ইমাম বুখারী রহ. সহ অধিকাংশ তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের মাযহাব হলো এক মজলিসে বা এক শব্দে তিন তালাক দিলে তিন তালাক হয়ে যাবে এবং অন্যত্র বিবাহের পর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে মেলা-মেশা না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য উক্ত স্ত্রী হালাল হবে না।

তৃতীয় মাযহাবের দলীলঃ-

১. আল্লাহ তাআলা বলেন ‘হে নবী! বলে দিন যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা কর,তখন তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিও... যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য পথ বের করে দিবেন’ (সূরা তালাক ১-২)

এই আয়াতে তালাকের শরয়ী পদ্ধতী বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো, এমনভাবে তালাক দেওয়া যার পরে ইদ্দত আসে এবং স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে। এই আয়াত প্রমাণ করে যে, ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য না রেখে তালাক দিলেও তালাক হয়ে যাবে। কেননা যদি না হয় , তাহলে সে নিজের উপর জুলুমকারীও হবে না এবং স্ত্রীকে ফেরত নেওয়ার পথও বন্ধ হবে না, যেদিকে এই আয়াত ইশারা করছে“ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য পথ বের করে দিবেন” ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এখানে পথ বের করার অর্থ হলো ফেরত নেওয়ার সুযোগ থাকা। যা একটু আগে উল্লেখ করা হলো।

২. এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একশত তালাক দিলে হযরত ইবনে আব্বাস রা. তাকে বললেন, তুমি তোমার প্রতিপালকের নাফরমানী করেছো, তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বায়েন হয়ে গেছে। তুমি তো আল্লাহকে ভয় করনি যে, আল্লাহ তোমার জন্য কোন পথ বের করে দিবেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন “ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য পথ বের করে দেন (ই-লাউস্ সুনান ৭/৭০৮)

৩. হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল। ঐ মহিলা অন্যজনকে বিবাহ করলে সেও তাকে তালাক দিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হল যে, সে কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, ‘না যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী প্রথম জনের মত ঐ মহিলার মধু আশ্বাদন না করবে’ অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাস না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। (সহীহ বুখারী:৫২৬১)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, এটা রিফা‘আ বিন ওয়াহাবের ঘটনা, যে তার স্ত্রীকে এক সাথে তিন তালাক দিয়ে ছিল, এটাই স্পষ্ট। রিফা‘আ আল কুরাযীর ঘটনা নয়, যে তার স্ত্রীকে সর্বশেষ তালাক দিয়েছিল। যে ব্যক্তি উক্ত দু’জনকে এক মনে করেছে সে ভুল করেছে, ভুলের উৎস হল, তালাক প্রাপ্তা উভয় মহিলাকেই আব্দুর রহমান বিন জাবীর রা. বিবাহ করে ছিলেন। (ফাতহুল বারী ৯/৫৮১)

৪. হযরত উয়াইমির রা. লি‘আনের পর বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আমার স্ত্রীকে রাখি, তাহলে তার উপর মিথ্যারোপ করেছি। একথা বলে তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দিলেন। (বুখারী: ৫২৫৯)

আল্লামা যাহেদ কাউসারী রহ. বলেন, কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কাজকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখান থেকে উদ্ভূত এটাই বুঝেছে যে, এক সাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হয়ে যায়, যদি উদ্ভূতের এই বুঝ সहीহ না হতো তাহলে সঠিকটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই বলে দিতেন। (তাকমিলাহ ১/১১২), ই‘লাউস সুনান ৭/৭০৬)

৫. হযরত হাসান বিন আলী রা. তার স্ত্রী আয়েশা বিনতে ফযলকে একসাথে তিন তালাক দিলেন। অতঃপর তার স্ত্রীর কথা শুনে কেঁদে ফেলেন এবং বললেন যদি আমি নানাকে (অন্য বর্ণনায় তার পিতার বরাত দিয়ে বলেন) একথা বলতে না শুনতাম যে, “যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, উক্ত স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ না বসা পর্যন্ত তার জন্য হালাল হবেনা, তাহলে অবশ্যই তাকে ফেরত নিতাম। (সুনানে বাইহাকী হা.নং ১৪৯৭১)

৬. মাহমূদ বিন লাবীদ রা. হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে যান। (নাসাঈ শরীফ হা.নং ৩৪৩১) এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাগান্বিত হওয়াই তিন তালাক হয়ে যাওয়ার প্রমাণ। কেননা এক সাথে তিন তালাক দেওয়া গুনাহের কাজ, এ গুনাহের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারাজ হয়ে ছিলেন।

৭. হযরত ইবনে উমর রা. তাঁর স্ত্রীকে হয়েয অবস্থায় তালাক দেন। এ হাদীসের শেষে আছে যে, হে আল্লাহর রাসূল! যদি তাকে তিন তালাক দিয়ে দিতাম তাহলে কি তাকে ফেরত নিতে পারতাম? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন তো সে তোমার থেকে বায়েন (সম্পূর্ণ পৃথক) হয়ে যেত এবং তোমার গুনাহ হত। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা. ৭৭৬৭)

৮. ওয়াকে‘ বিন সাহবান রা. বলেন যে, ইমরান বিন হাসীন রা.কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল যে তার স্ত্রীকে এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছে, ইমরান

রা. উত্তর দিলেন, সে তার প্রতিপালকের নাফরমানি করেছে এবং তার জন্য তার স্ত্রী হারাম হয়ে গেছে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা. ১৮০৮৮)

৯. হযরত উমর রা. এর কাছে এক ব্যক্তিকে আনা হল, যে তার স্ত্রীকে একহাজার তালাক দিয়েছে আর সে বলছে এর দ্বারা আমি খেল-তামাশা করেছি, হযরত উমর রা. তাকে বেত্রাঘাত করে বললেন, একহাজার থেকে তোমার জন্য তিনটিই যথেষ্ট হয়ে গেছে। (মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাক হা. ১১৩৪০, সুনানে বাইহাকী হা. ১৪৯৫৭)

১০. মুহাম্মদ বিন ইয়াছ রহ. ইবনে আব্বাস ও আবু হুরাইরা রা. কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, গ্রামের একলোক তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বেই তিন তালাক দিয়েছে। এ সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি? ইবনে আব্বাস রা. আবু হুরাইরা রা.কে বললেন, আপনার কাছে একটি জটিল মাসআলা এসেছে, আপনি এর সমাধান দিন। আবু হুরাইরা রা.বললেন, এক তালাক তাকে বায়েন করে দিয়েছে আর তিন তালাক তাকে হারাম করে দিয়েছে যতক্ষণ না সে অন্যজনকে বিবাহ করে। ইবনে আব্বাস রা.ও অনুরূপ উত্তর দেন। (মুআত্তা ইমাম মালেক হা. ৬৫৯)

এখানে মাত্র কয়েকটি হাদীস পেশ করা হল,এ ছাড়া সাহাবা, তাবেঈ ও তাবেতাবেঈ থেকে আরো অনেক হাদীস ও ফাতাওয়া আছে যা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হল, তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হবে; লা-মায়হাবী ভাইদের মতানুযায়ী তিন তালাকে এক তালাক হবে না। বরং তিন তালাকে তিন তালাকই হবে।

ইজমায়ে উম্মাত

১.হাফেজ ইবনে রজব রহ. বলেন, জেনে রাখো কোন সাহাবা কোন তাবেঈ ও সালফে সালেহীনদের মধ্যে যাদের কথা হালাল-হারাম ও ফাতওয়ার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হয়, তাদের কারো থেকে এ ধরনের সুস্পষ্ট কথা বর্ণিত হয়নি যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পর এক শব্দে তিন তালাক দিলে এক তালাক ধরা হবে। (ইন্লাউস সুনান ৭/৭১০)

২. ইবনে তাইমিয়াহ রহ. (যিনি এক তালাক হওয়ার প্রবক্তা) বলেন, এক শব্দে তিন তালাক দিলে স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে এবং তিন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। এটা ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমাদের শেষ উক্তি এবং অধিকাংশ সাহাবা ও তাবেঈ থেকে বর্ণিত। (ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়াহ ১৭/৮)

৩. ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, (তিনিও এক তালাকের প্রবক্তা) ‘এক শব্দে তিন তালাক দিয়ে দিলে তালাক হওয়ার ব্যাপারে চারটি মায়হাব আছে। ১. তিন তালাকই হয়ে যাবে, এটা চার ইমাম,অধিকাংশ তাবেঈ ও সাহাবাদের মায়হাব...।’ (লাজনা তুত দায়িমাহ এর উদ্ধৃতিতে আহসানুল ফাতওয়া ৫/৩৬৬)

এছাড়াও হাফেজ ইবনুল হুমাম ফতহুল কাদীরে, ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে, ইমাম তহাবী শরহু মাআনিল আসারে, আবু বকর জাসসাস আহকামুল কুরআনে, আবুল ওয়ালীদ বাজী আল-মুনতাকাতে, ইবনুল হাদী সিয়ারুল হাসসি ফী ইলমিত তালাকে, আল্লামা যুরকানী শুরহে মুআত্তায়, ইবনুততীন শরহে বুখারীতে, ইবনে হাযাম জহেরী মুহাল্লাতে, আল্লামা খাত্তাবী শরহে সুনানে আবু দাউদে, হাফেয ইবনে আব্দুল বার তামহীদ ও ইস্তিযকারে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, হযরত উমর রা. এর যুগে একই মজলিসে তিন তালাকে তিন তালাক হওয়ার উপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, ‘সাহাবাগণের ইজমা দলীল হওয়ার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতৈক্য কায়েম হয়েছে।’ (ফতহুল বারী:১৩/২৬৬)

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, ‘মাশায়েখ ও ইমামগণের কোনো বিষয়ে ইজমা কায়েম হলে তা অকাট্য দলীল হিসাবে বিবেচিত হবে’। (উমদাতুল আসাস পৃ.৪২)

ইবনুল কাইয়িম আল জাওযিয়া রহ. বলেন, ‘রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত ও সাহাবাগণের আমলের পর আর কারো কথা মেনে নেওয়া হবে না।’ (এগাসাতুল লাহফান পৃ.১৯২)

৪. চার ইমামের মাযহাবের বিপরীত যা আছে, তা ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থী, যদিও তাতে অন্যদের দ্বিমত থাকে। (আল-আশবাহ ওয়াননাযায়ের পৃ.১৬৯)

উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল যে, এক মজলিসে বা এক শব্দে তিন তালাক দিলে তিন তালাই হবে; এক তালাক নয়।

২য় মাযহাবের দলীল ও তার জবাবঃ

১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, হযরত রুকানা রা. তার স্ত্রীকে এক মজলিসে তিন তালাক দিলেন এবং পরে তিনি খুব মর্মান্বিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কীভাবে তালাক দিয়েছ? তিনি বললেন, আমি তিন তালাক দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন এক মজলিসে দিয়েছ? তিনি বললেন হ্যাঁ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এটা এক তালাক, যদি চাও তাহলে তাকে ফিরিয়ে নাও। (মুসনাদে আহমাদ:২৩৯১)

জবাবঃ এই ঘটনার বর্ণনায় ভিন্নতা পাওয়া যায়, এখানে আছে যে তিনি তাকে তিন তালাক দিয়েছে। আর আবু দাউদ শরিফের বর্ণনায় আছে যে ‘বাত্তাহ’ শব্দ দ্বারা তালাক দিয়েছেন। এই দুই ধরনের বর্ণনার কারণে, ইমাম বুখারী রহ. এই হাদীসকে ‘মা’লুল’ বলেছেন। ইবনে আব্দুল বার এই হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন। (তালখীসুল হাবীর:১৬০৩)

ইমাম জাসসাস ও ইবনে হুমাম রহ. মুসনাতে আহমাদের বর্ণনাকে ‘মুনকার’ বলেছেন। (তাকমিলাহ ১/১১৫)

ইবনে হাজার রহ. বলেন, ইমাম আবু দাউদ ‘বাতাহ’ শব্দ দ্বারা তালাক দেওয়াকে রাজেহ বলেছেন। কোন বর্ণনাকারী এটাকেই তিন তালাক বুঝে সেভাবে বর্ণনা করেছেন। এই কারণে ইবনে আব্বাসের পরবর্তী হাদীস দ্বারাও দলীল দেওয়া যাবে না। (ফাতহুল বারী ৯/৪৫৪, তাকমিলাহ ১/১১৫)

২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে, আবু বকরের যুগে ও খিলাফতে উমরের প্রথম দুই বছর (কোন বর্ণনায় তিন বছর) তিন তালাক এক তালাক ছিল। অতঃপর, হযরত উমর রা. বলেন, লোকেরা এমন বিষয়ে তাড়াহুড়া করছে যে বিষয়ে তাদের অবকাশ ছিল। হায় ! যদি আমি তাদের উপর তা কার্যকর করতাম। অতঃপর, তিনি তা কার্যকর করলেন। (মুসলিম শরীফ: ৩৬৫৪)

জবাবঃ ক. হাফেজ আবু যুরআহ রহঃ বলেন, এই হাদীসের অর্থ হল, বর্তমানে লোকদের একসাথে তিন তালাক দেওয়ার যে প্রচলন দেখা যাচ্ছে তা রাসূলের যুগে, আবু বকরের যুগে ও খিলাফতে উমরের দুই বছরে ছিল না। তখন লোকেরা সুন্নাত তরীকায় তিন তুহুরে তিন তালাক দিতেন। (সুনানে বাইহাকী: ১৪৯৮৪)

খ. আর যদি হাদীসের অর্থ এই হয় যে, এক শব্দে তিন তালাক দিলে বর্তমানে তিন ধরা হয়, অথচ রাসূলের যুগে, আবু বকরের যুগে ও খিলাফাতে উমরের প্রথম দুই বছর তা এক তালাক ধরা হত। তা হলে এর উত্তর হলো- এ মাযহাবের দুটি হাদীস, উভয়টি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। অথচ তার ফাতওয়া হলো, এক শব্দে বা এক মজলিসে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হয়ে যায়। যা দলীল নং ২৩ ও ১০-এ উল্লেখ করা হয়েছে। আর ইয়াহইয়া বিন মাঈন, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান, আহমাদ বিন হাম্বল ও আলী ইবনুল মাদীনীর মতো বড় বড় মুহাদ্দিসীদের মাযহাব হল, যখন কোন রাবী তার হাদীসের বিপরীত আমল করে বা ফাতওয়া দেন, তখন তার বর্ণিত হাদীসটি আমলযোগ্য থাকে না। সুতরাং ইবনে আব্বাসের এই হাদীসদ্বয়ও আমলের যোগ্য নয়; বিভিন্ন আপত্তির কারণে তা অগ্রহণযোগ্য। (ইংলান্ড সুনান ৭/৭১৬)

গ. এই হাদীস একটি বিশেষ ক্ষেত্রে, তাহলে যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলত, তুমি তালাক, তুমি তালাক, তুমি তালাক। এবং বিচারকের সামনে দাবী করত যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বলে প্রথমটির তাকীদ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল; ভিন্ন তালাক উদ্দেশ্য ছিল না। তাহলে কাযী তার দাবী কবুল করতেন এবং তার কথাকে বিশ্বাস করে এক তালাকের ফাতওয়া দিতেন। কিন্তু হযরত উমরের যুগে লোকজন বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের দীনদারী কমতে থাকে, তখন হযরত উমর রা. বিচার ব্যবস্থায় এ ধরনের

দাবী কবুল না করার আইন কার্যকর করেন এবং ওই শব্দ দ্বারা তার বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নেন, তথা তিন তালাক হওয়ার ফাতওয়া কার্যকর করেন। (তাকমিলাহ ১/১১৪, ফাতহুল বারী ৯/৪৫৬)

যদি তাই না হত এবং উমর রা. এর এ সিদ্ধান্ত শরীয়তে মুহাম্মদীর বিপরীত হতো, তাহলে ইবনে আব্বাসসহ সকল সাহাবায়ে কেলাম কখনোই তা মেনে নিতেন না। যেমন- উম্মে ওলাদকে বিক্রি করা, এক দিনারকে দুই দিনারের মাধ্যমে বিক্রি করা, এবং হজে তামাত্তু এর মাসআলায় হযরত ইবনে আব্বাস স্পষ্ট ভাষায় হযরত উমরের বিরোধিতা করেছেন। (আহসানুল ফাতাওয়া ৫/৩৬৯)

যদি কেউ বলে যে, হযরত উমরের ভয়ে সাহাবারা তার প্রতিবাদ করেনি (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক) সাহাবায়ে কেলাম সম্পর্কে এমন ধারণা পুরা দীনকে ভিত্তিহীন করে দিবে, যা কোন অবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন যে, কারো জন্য এই ধারণা করা জায়েয নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেলাম রাসূলের শরীয়ত পরিপন্থী কোন বিষয়ের উপরে একমত হয়েছেন। (মাজমুআতুল ফাতাওয়া ১৭/২২)

সর্বশেষ কথাঃ

আমাদের গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুদেরকে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা মদীনার আমল দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন, অথচ সৌদি সরকার কর্তৃক মক্কা-মদীনাসহ দেশের বড় বড় উলামাদের নিয়ে গঠিত কমিটিকে সৌদি সরকার যখন এ মাসআলার তাহকীক পেশ করার নির্দেশ দেয়, তখন তারা দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এক শব্দে বা এক মজলিসে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হবে। (এ-ঘটনা আহসানুল ফাতওয়ার ৫ম খণ্ডের ২২৫-৩৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।) আল্লাহ তাআলা আমাদের হক মেনে নেওয়ার তাওফীক দান করুন।

আত্মার ব্যাধির চিকিৎসা ফরয

১. হযরত নুমান বিন বশীর রা. বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘শুনে রেখো নিশ্চয়ই শরীরে এমন একটি গোশতের টুকরা আছে যখন তা সুস্থ থাকে তখন গোটা শরীরই সুস্থ থাকে। আর যখন তা রোগাক্রান্ত থাকে তখন গোটা শরীরই অসুস্থ থাকে। শুনে রেখো সেই গোশতের টুকরা হল কলব তথা আত্মা’। (বুখারী শরীফ হা.নং৫২, হাদীসটি দীর্ঘ একটি হাদীসের অংশ বিশেষ)

২. হযরত উকবা ইবনে আমের রা. বলেন, ‘একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, নাজাতের উপায় কি? তিনি বললেন, নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখো, নিজের ঘরে পড়ে থাক এবং নিজের পাপের জন্য কাঁদো’। (তিরমিযী হা.নং২৪০৬)

৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ‘যখন আদম সন্তান ভোরে ওঠে তখন তার অঙ্গসমূহ জিহ্বাকে বিনয়ের সাথে বলে, আমাদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আমরা সবাই তোমার সাথে জড়িত। সুতরাং তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকব। আর তুমি বাঁকা হলে আমরাও বাঁকা হয়ে পড়ব’। (তিরমিযী হা.নং২৪০৭)

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যখন কোনো বান্দা মিথ্যা বলে তখন এর দুর্গন্ধে ফেরেশতারা তার নিকট থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়’। (তিরমিযী হা.নং১৯৭২)

৫. হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, সাফিয়া সম্পর্কে আপনাকে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সে এইরূপ এইরূপ। তিনি এর দ্বারা বুঝাতে চেয়ে ছিলেন যে, তিনি বেঁটে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘যদি তোমার এই কথাকে সমুদ্রে মিশিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এটা সমুদ্রের রং পরিবর্তন করে দিবে’। (আবু দাউদ হা.নং৪৮৭৫)

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা কোনো (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করবে না, ঠাট্টা করবে না এবং এমন ওয়াদা করবে না যা রক্ষা করতে পারবে না’। (তিরমিযী হা.নং ১৯৯৫)

৭. হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ তোমরা বদ ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ ধারণা হচ্ছে নিকৃষ্ট মিথ্যা। তোমরা আড়ি পেত না, গোপন দোষ অন্বেষণ করো না , হিংসা করো না, বিদ্বেষ পোষণ করো না, সম্পর্কচ্ছেদ করো না, হে আল্লাহর বান্দারা ! তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও’। বুখারী হা.নং ৫১৪৩

৮. হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে’। (আবু দাউদ হা.নং ৮৯০৩)

৯. হযরত জাবের রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো। কেননা জুলুম কিয়ামাতের দিন বহুমুখী অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে। আর তোমরা লোভ এবং কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা লোভ ও কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে। লোভ ও কৃপণতার বশবর্তী হয়ে তারা পরস্পর রক্ত পাত করেছে এবং নিজেদের উপর হারাম বস্তুকে হালাল করেছে’। (মুসলিম হা.নং ২৫৭৮)

১০. হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নিজের নেক আমল মানুষের কাছে প্রকাশ করে আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন তাকে লাঞ্ছিত করবেন। আর যে ব্যক্তি এই জন্য লোক সম্মুখে নিজের নেক আমল প্রকাশ করে যে, মানুষ তাকে মহৎ মনে করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন তার অন্তরের অবস্থা সকলের সামনে প্রকাশ করে দিবেন’। (বুখারী হা.নং ৬৪৯৯)

১১. হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, ‘রাগ করো না’। সে কয়েকবার এই কথা জিজ্ঞেস করল, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও প্রত্যেক বার একই জবাব দিলেন যে ‘তুমি রাগ করো না’। (বুখারী হা.নং ৬১১৬)

১২. হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে আরও বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘অন্যকে ধরাশায়ী করতে পারলেই বীর হওয়া যায় না; বরং প্রকৃত বীর হলো ঐ ব্যক্তি, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে’। (বুখারী হা.নং ৬১১৪)

১৩. হযরত বাহায ইবনে হাকীম রা. তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ক্রোধ ঈমানকে এমনভাবে বিনষ্ট করে, যেমনি-ভাবে ‘ছাবীর’ মধুকে বিনষ্ট করে দেয়’। (ছাবীর এক প্রকার তিতা ফল, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে তা পাওয়া যায়।) (তিরমিযী হা.নং ২৯৪৪)

১৪. হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নিজের রসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন। আর যে ব্যক্তি নিজের গোষ্ঠা দমন করে রাখে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা তার উপর থেকে আযাব সরিয়ে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি নিজের অপরাধের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়, আল্লাহ পাক তার ওয়র কবুল করেন’। (শুআবুল ইমান হা.নং ৭৯৫৯)

১৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘এমন কোনো ব্যক্তি দোষখে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকবে। পক্ষান্তরে এমন কোনো ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে’। (মুসলিম হা.নং ৯১)

১৬. হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা বলেন, অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার ইয়ার। সুতরাং যে ব্যক্তি এর কোনো একটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করবে, আমি তাকে

দোযখে ঢুকাব। অপর একটি বর্ণনায় আছে তাকে আমি দোযখে নিক্ষেপ করব’।
(মুসলিম হা.নং২৬২০)

১৭. হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মানুষ এমনভাবে আত্মগর্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে যে, অবশেষে তার নাম উদ্ধত-অহংকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়, ফলে তার উপর সেই আযাবই নেমে আসে যা তাদের উপর নেমে থাকে’। (তিরমিযী হা.নং২০০০)

১৮. হযরত আবু সাঈদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পছাণ্ডলি এক এক বিষত ও এক এক হাত পরিমাণে অনুসরণ করে চলবে, এমনকি তারা যদি গুঁই সাপের গর্তেও ঢুকে থাকে তাহলে তোমরাও এব্যাপারে তাদের অনুসরণ করবে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তারা কি ইয়াহুদ ও নাসারা ? তিনি বললেন, তবে আর কারা ? (বুখারী হা.নং৩৪৫৬)

উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হল যে, মানুষের শরীরের মত মানুষের অন্তরও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। যেসব রোগের একেকটি এত-বেশি ক্ষতিকর যে, একটি রোগই যে কোনো মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই শরীর রোগাক্রান্ত হলে যেমনি-ভাবে আমরা তার চিকিৎসা করে থাকি, তেমনিভাবে আত্মা রোগাক্রান্ত হলে তার চিকিৎসা করাও জরুরী। বরং আত্মার রোগের চিকিৎসা শরীরের রোগের তুলনায় অনেক বেশি জরুরী।

কুরআনে পাকে আল্লাহ তাআলা আত্মার রোগের চিকিৎসার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন: **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ** ‘যে ব্যক্তি আত্মাকে পরিশুদ্ধ कराবে সে সফলকাম হবে’ (সূরা শামস-৯)

এই আয়াতের তাফসীরে হাসান বসরী র. বলেন,

معناه: قد أفلح من زكى نفسه فاصلحها و حملها على طاعة الله . تفسير المظهرى ২৪৭/১০

অর্থাৎ: নিশ্চয়ই সফলকাম হবে ঐ ব্যক্তি যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ कराবে তথা আত্মাকে সংশোধন कराবে এবং আত্মাকে আল্লাহর আনুগত্যের উপর উদ্বুদ্ধ कराবে। (তাফসীরে মাজহারী ১০/২৪৭)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, আল্লাহ তাআলা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করাতে বলেছেন। বুঝা গেল যে, আত্মা একা একা পরিশুদ্ধ হয় না; বরং কোনো আহলে দিল বুয়ুর্গের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করাতে হয়। তাই সাহাবায়ে কেরাম রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে নিজেদের আত্মার চিকিৎসা করিয়েছেন, পরিশুদ্ধ করিয়েছেন। নিজের আত্মার চিকিৎসা নিজে করেননি। তাই আমাদের জন্য ফরয হল, কোনো হক্কানী, রব্বানী, নায়েবে নবীর মাধ্যমে নিজ আত্মার চিকিৎসা করানো। শরীরের

রোগের চিকিৎসার জন্য যেমনি-ভাবে আমরা ডাক্তারের দ্বারস্থ হয়ে থাকি ঠিক তেমনিভাবে আত্মার রোগের চিকিৎসার জন্য যারা আত্মার রোগের পরামর্শ-পত্র দেন তাদের দ্বারস্থ হতে হবে। হ্যাঁ পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আত্মার রোগের চিকিৎসা করা ফরয আর শরীরের রোগের চিকিৎসা করা সুন্নাত ।

যারা আত্মার রোগের চিকিৎসা না করেই মারা যাবে তাদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেছেন: **وقد خاب من دسها** ‘আর ব্যর্থ-কর্ম হবে সে যে আত্মাকে (গুনাহের মধ্যে) ধ্বসিয়ে দিবে ’ (সূরা শামস-১০) তাছাড়া ১৮নং হাদীসেও তাদের পরিণতির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ-ওয়ালাদের সোহবতে এসে আত্মার চিকিৎসা না করালে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের অনুসরণ করতে বাধ্য করা হবে।

আর নিম্ন বর্ণিত হাদীসে আত্মার রোগের চিকিৎসা না করার কারণে শহীদ, আলেম ও দানবীরদের করুণ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে সে হবে একজন শহীদ (ধর্ম যুদ্ধে প্রাণ-দানকারী)। তাকে আল্লাহ তাআলার দরবারে আনা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে (প্রথমে দুনিয়াতে প্রদত্ত) নেয়ামাতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন; আর সেও তা (নেয়ামাত প্রাপ্তির কথা) স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি এসব নেয়ামাতের বিনিময়ে দুনিয়াতে কি আমল করেছ? জবাবে সে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য (কাফিরদের বিরুদ্ধে) লড়াই করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করনি; বরং তুমি এজন্য লড়াই করেছ যে, তোমাকে বীর বলা হবে। আর তোমাকে তা বলাও হয়েছে। এরপর তার ব্যাপারে (ফেরেশতাদেরকে) আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। এরপর এমন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে নিজে দ্বীনী ইলম শিখেছে এবং অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে আর সে কুরআন শরীফও পড়েছে। আল্লাহ তাআলা তাকেও দুনিয়ার নেয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সেও তা স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, এসব নেয়ামাতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য তুমি কি আমল করেছ? উত্তরে সে বলবে, আমি ইলম শিখেছি এবং অপরকেও তা শিখিয়েছি। আর তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন মাজীদ পড়েছি। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো এজন্য ইলম শিখেছ যাতে তোমাকে আলেম বলা হয় আর এজন্য কুরআন পড়েছ যাতে তোমাকে কারী বলা হয়। আর তা তোমাকে বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। এরপর এমন ব্যক্তির বিচার শুরু হবে যাকে আল্লাহ তাআলা সবধরনের অর্থ-সম্পদ দান করে

বিভবান বানিয়েছিলেন। তাকে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে তার প্রদত্ত নেয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সেও তা স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, এসমস্ত নেয়ামাতের মোকাবেলায় তুমি আমার জন্য কি করেছ? সে বলবে, যেসব ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ কর তার একটিও আমি হাতছাড়া করিনি। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো এজন্য দান করেছ, যাতে করে তোমাকে দানবীর বলা হয়। আর তা তোমাকে বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপড় করে টানা হবে অবশেষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’। (সহীহ মুসলিম হা.নং ১৯০৫)

আত্মার রোগের চিকিৎসা না করার কারণেই মূলত উপরিউক্ত শহীদ, আলেম ও দানবীরের এই করুণ পরিণতি হয়েছে। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত হলো, নিজ আত্মার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। কোনো হক্কানী পীর বা শায়খকে নিজ আত্মার অবস্থা জানিয়ে আত্মার চিকিৎসা করা। আল্লাহ তাআলা সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

অনেক সহীহ হাদীস রহিত হয়ে গেছে, কাজেই সঠিক অর্থে সহীহ হাদীস এর উপর আমল করতে হলে সুন্নাহ মেনে চলতে হবে

অনেক সহীহ হাদীস রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে হাদীসের কিতাবের সকল হাদীস আমলযোগ্য নয়, শুধু যে সব হাদীস সুন্নাহ পর্যায়ে তার উপর আমল করতে হবে, যার সারমর্ম হল ফিকহের কিতাবসমূহ। এ সম্পর্কে কিছু হাদীস ও আছার নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করতে উপদেশ দিচ্ছি এবং আমীরের কথা শুনতে ও তার অনুগত থাকতে উপদেশ দিচ্ছি, যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অচিরেই অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাহকে এবং হেদায়েত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। অতএব সাবধান ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর বাহিরে নতুন কথা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেক নতুন কথাই বিদ্‌আত। (সুন্নাতে দারেমী হাদীস নং ৯৬)

২. হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, হে প্রিয় বৎস ! যদি তুমি এভাবে সকাল-সন্ধ্যা কাটাতে পার যে, তোমার অন্তরে কারো প্রতি হিংসা নেই, তবে তা কর। অতঃপর তিনি বললেন, প্রিয় বৎস ! এটা আমার সুন্নাহ। আর যে আমার সুন্নাহকে যিন্দা করল সে

আমাকেই ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।
(তিরমিযী শরীফ হাদীস নং ২৬৮৩)

৩. হযরত মালেক রহ. থেকে বর্ণিত, তার নিকট পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিষ রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে জিনিষ দুটি আঁকড়ে ধরবে পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। (মুয়াত্তা মালেক হাদীস নং ৬৮৫)

৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল খাবে এবং সুন্নাহর উপর আমল করবে এবং যার অনিষ্ট থেকে সকল মানুষ নিরাপদ থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর একলোক বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল, এমন লোক তো আজকাল অনেক। ছয়র বললেন, আমার পরবর্তী যুগসমূহেও এমন লোক থাকবে। (তিরমিযী শরীফ হাদীস নং ২৫২৫)

৫. হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সাহাবী রাসূলের বিবিগণকে মানুষের অগোচরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর তাদের কেউ বললেন, আমি মহিলাদের বিবাহ করব না। কেউ বললেন, আমি আর গোশত খাব না। আর কেউ বললেন, আমি আর বিছানায় ঘুমাব না। অতঃপর নবী আলাইহিস সালাম আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং ছানা পড়লেন আর বললেন মানুষের কি হল ? তারা এমন এমন বলে ! অথচ আমি নামায পড়ি এবং ঘুমাই, নফল রোযা রাখি এবং রোযা ছেড়ে দেই এবং আমি মহিলাদের বিবাহও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়। (মুসলিম শরীফ হাদীস নং ১৪০১)

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহসমূহের এমন কোন সুন্নাহকে যিন্দা করেছে যা আমার পরে পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল তার জন্য সে সকল লোকের সওয়াবের পরিমাণ সওয়াব রয়েছে যারা এর উপর আমল করবে। অথচ তাদের থেকে বিন্দু পরিমাণ সওয়াব হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন গোমরাহীর নতুন পথ আবিষ্কার করেছে যার উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল রাজী নন, তার জন্য সে সকল লোকের গোনাহের পরিমাণ গুনাহ রয়েছে যারা এর উপর আমল করবে। অথচ তাদের গুনাহ থেকে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না। (তিরমিযী শরীফ- হাদীস নং ২৬৮২)

৭. হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় খুতবা দিলেন। তিনি বললেন, শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছে যে, তোমাদের এই যমীনে তার ইবাদত করা হবে। তবে ইবাদত ব্যতীত তোমরা যে সব আমলকে ছোট মনে কর সে সব জিনিষে তার আনুগত্য করা হবে এ

ব্যাপারে সে আশাবাদী। অতএব হে মানবসকল সাবধান ! আমি তোমাদের নিকট এমন জিনিষ রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধর কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ। (মুসতাদরাকে হাকেম ১/৯৩)

৮. হযরত ইবনে হারেস ছুমালী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখনই কোন জাতি একটি বিদআত সৃষ্টি করেছে তখনই একটি সুন্নাহকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং কোন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা বিদআত সৃষ্টি করা থেকে উত্তম। (মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ১৬৯৭২)

৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিটি কাজের উত্থান রয়েছে। আর প্রতিটি উত্থানের একটি স্থিতিশীলতা রয়েছে। অতএব যার উত্থান আমার সুন্নাহর দিকে হবে সে সফলকাম। আর যার উত্থান আমার সুন্নাহ ব্যতিরেকে হবে সে ধ্বংস। (ইবনে হিব্বান হাদীস নং ১১)

১০. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইলম তিন প্রকার; আয়াতে মুহকামার ইলম, সুন্নাতে কায়েমার ইলম, এবং ফরীযায়ে আদেলার ইলম। ইহা ব্যতীত সব অতিরিক্ত। (আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং ২৮৮৫)

উপরে উল্লেখিত প্রতিটি হাদীসে সুন্নাহর অনুসরণের এবং তা আঁকড়ে ধরার কথা বলা হয়েছে। এধরণের হাদীস বিশুদ্ধ হাদীসের কিতাবসমূহে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে নমুনাস্বরূপ কিছু হাদীস উল্লেখ করা হল মাত্র। কিন্তু, এমন কোন হাদীস পাওয়া যায়না যেখানে হাদীসের অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। কেননা হাদীস সুন্নাহ থেকে ব্যাপক। রহিত হাদীসসমূহ এবং নবী আলাইহিস সালামের সাথে বা কোন সাহাবীর সাথে খাস হুকুম সম্বলিত বর্ণনা হাদীস হলেও সুন্নাহ নয়, বরং সুন্নাহ হল নবী আলাইহিস সালাম উম্মতের অনুসরণের জন্য যা রেখে গেছেন এবং যা রহিত হয়নি। এজন্য নাজাত-প্রাপ্ত দলের নাম রাখা হয়েছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ। অর্থাৎ যারা রাসূলের সুন্নাহকে সাহাবায়ে কেরামের জামাআতের মাধ্যমে অনুসরণ করে।

কোন হাদীস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত আর কোনটি সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত নয় তা হক্কানী উলামাদের নিকট স্পষ্ট। হাদীসের কিতাব অধ্যয়ন করে জনগণের পক্ষে তা বুঝা সম্ভব নয়, সুতরাং উলামায়ে কেরাম থেকে না বুঝে একা একা হাদীস রিসার্চ করে আমল করা মারাত্মক গোমরাহী।

সমাপ্ত